মোহনা

বিমল কর

সাহিত্য প্রকাশ
৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬০

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাসগুপ্ত

মুদ্রাকর : শ্যামলকুমার গরাই, রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস,
১২, বিনোদ সাহা লেন, কলিকাতা-৬

লেখকের অন্যান্য বই

যাদুকর

পূর্ণ-অপূর্ণ

বালিকা বধূ

অসময়

খড়কুটো

যদুবংশ

আকাশ কুসুম

মোহনা

ময়না এসে হাসিমুখে বলল, "আমায় একটা ছেলে যোগাড় করে দে ; বিয়ে করব।"

দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল, মুখ মুছে ময়নার দিকে সহাস্য চোখে তাকালাম। "কি ব্যাপার তোর? হঠাৎ?"

ময়না ততক্ষণে আমার বিছানায় বসে পড়েছে। বলল, "কিসের হঠাৎ? বিয়ের?"

"আরে না না, তুই আর আসিস না বড়, তাই বলছি···."

"বলিস না, সেদিনও এসেছি।"

"কবে?"

"তুই ছিলিস না ; মাসি বলল, কলকাতার বাইরে কোথায় গিয়েছিস।"

কলকাতার বাইরে আমায় মাঝে-মধ্যেই যেতে হয়, শেষবার গিয়েছি শীতের গোড়ায়, এখন শীত চলছে। ময়না এসেছিল আমি জানতাম না, আমায় কেউ বলে নি। বলার মতন খবরও কিছু ছিল না বোধ হয়। আজও যে ময়না এসেছে আমি জানতে পারতাম না যদি-না বাড়ির মধ্যে একটা অট্টরোল উঠত। আগে ময়না এলে বাড়িতে নানারকম রোল উঠত, আজকাল তেমন বড় শুনি না। দাড়ি কামানোর সরঞ্জামগুলো তুলে রাখতে রাখতে বললাম, "তোকে অনেক দিন পরে দেখছি।"

ময়না আমার চোখের ওপর তার সকৌতুক, সামান্য ধারালো, চঞ্চল দৃষ্টি ফেলে বলল, "কেমন দেখছিস, ফুলদা? বিয়ের কনে হতে পারব কি না দেখছিস?" বলে হাসিমুখে ময়না পিঠ দুইয়ে দোল খাওয়ার ভঙ্গি করল, করেই মাথার খোঁপায় হাত দিয়ে ঘাড়

বৈকাল; বলল, "আমার চুল এখনও পাকে নি; …ভাবিস না নকল কিনে খোঁপা ফুলিয়েছি…; হাত দিয়ে দেখতে পারিস।" ময়না ঘাড় সোজা করল। "দাঁত দেখবি? দেখ…। একটাও পড়ে নি। কষ দাঁতে একটা গর্ত আছে—ভরিয়ে রেখেছি। আর কি দেখবি বল? এই দেখ হাত এখনও নরমটরম। পা দেখবি—?" বলে ময়না তার শাড়ির খানিকটা পায়ের ওপর তুলে ধরল, ডিম পর্যন্ত। তার পায়ের গোছ ভারী, মোলায়েম, সুন্দর।

ময়নার ভাল নাম মোহনা; আমরা ডাকি ময়না বলে। এক সময়ে আমি ওকে 'মোহ' বলেও ডেকেছি। ময়না আমার আত্মীয়া, মেজমাসির মেয়ে; মার সঙ্গে মেজমাসির রক্তের সম্পর্কটা খুব নিকট নয়, যথেষ্ট দূরেরও নয়। ছেলেবেলা থেকেই ময়নাদের সঙ্গে আমাদের মেশামিশি করে কেটেছে, তখন ওরা কাছাকাছি থাকত, এখন এখান থেকে দূরে চলে গেছে, ভবানীপুরের দিকে। মেজমাসির বড় মেয়ের নাম অঞ্জনা, ছোট মোহনা, মোহনার পরে এক ছেলে—জ্যোতি। মোহনা নামটা মাসি বা মেসোমশাই-কে যে দিয়েছিলেন আমরা জানি না, কেন দিয়েছিলেন তাও নয়; বোধ হয় কিছু মনে করেই।

মোহনার সঙ্গে আমি বাল্যাবধি মানুষ হয়েছি। ও কিন্তু আমার ঠিক সমবয়সী নয়। আমাদের মধ্যে বয়সের সামান্য তফাত আছে। মোটামুটি আমরা বছর চারেকের ছোট বড়। তবু একটা বয়স থেকে আমরা সমবয়সীর মতন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম। সে বরাবর আমাকে তুই বলত, পরে কখনও কখনও তুমি বলেছে। এখন কখনও তুই, কখনও তুমি।

মোহনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আগাগোড়া সাদামাটা ছিল না। আমাদের মধ্যে বাঁধাধরা আত্মীয়তা ছাড়াও নানা সময়ে নানা রকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আপাতত আমরা বন্ধুত্ব ও প্রীতির পিঠটাই দেখি, উলটো পিঠ দেখি না, দেখতে চাই না হয়ত।

মোহনা বরাবরই নিজের একটা ধাত বজায় রেখে কাটিয়ে যাচ্ছে। সে খানিকটা বেশি রকম স্পষ্ট, মেয়েদের সমাজের পক্ষে যথেষ্ট অনাবৃতই বলা চলে। তার আচরণ প্রায়ই এত মুক্ত হয়ে ওঠে যে তাকে স্বাভাবিক ভাবতে অনেকের বাধবে। আত্মীয়-স্বজন তাকে নির্লজ্জ, নির্বোধ বলেছে; তার কুখ্যাতি অনেক, নিন্দা অপবাদ অজস্র। তবু মোহনা নিজের ধাতের জোরেই যেন আত্মীয়-স্বজনের মুখের সামনে সোজা পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বরাবরই ময়নাকে পছন্দ করে এসেছি। যখন সে ফ্রক পরে কাঁধ পর্যন্ত চুল ছড়িয়ে ঘুরত তাকে প্রায়ই বলতাম, বড় হলে তুই ডেঙ্গাবাস হয়ে যাবি; শাড়ি পরতে শুরু করলে বলেছি, ময়না তুই বোরখা পর—আর পাবা যাচ্ছে না। তারপর মোহনার তরুণী ও যুবতী অবস্থায় আমার গবম নিশ্বাসে তার গাল পুড়িয়ে বলেছি, তুই মোহ, তুই ভ ষণ মোহ।

আজ আমার চোখে মোহনা কতটা মোহ তা গুছিয়ে ভাবি না আর। ওর ওপর আমার অবশিষ্ট মোহ হয়ত কিছু আছে, মমতা বোধ হয় তারও বেশি। মোহনার বয়েস এখন বছর তিরিশ। সচবাচর তার মতন মাথায় উঁচু মেয়ে দেখা যায় না; পাশাপাশি দাঁড়ালে আমার মতন লম্বা মানুষেরও সে প্রায় গাল ছুঁয়ে ফেলে। তার গায়ের রঙ নতুন শ্লেট-পাথরের মতন অনেকটা, ঠিক কালচে নয়, কালোর মিশেল দেওয়া ধূসর এক রঙ—যা কখনও কখনও শেষ বিকেলের আকাশে দেখা যায়। ওই রঙের ওপর এমন এক মসৃণতা যা দেখলে মনে হয় আভা ফুটে আছে। ছিপছিপে গড়ন বলতে যা বোঝায় মোহনা তা নয়। তার গড়ন মাপাজোপা, খুঁত তেমন কিছু চোখে পড়ে না। গলা ঈষৎ লম্বা হয়ত, কিন্তু কাঁধের দু' পাশ পুরু ডানার মতন নোয়ানো, ওপর বুকের আদল অল্প উঁচু—প্রতিমার আদলের মতন, নীচের বুক সুঠাম, দৃঢ়। তার স্তনে বাহুল্য নেই, ভীরুতাও নয়। ওর কোমর হালকা, যেন

অনায়াসেই অসাধ্যসাধন করে সামনে পেছনে বা পাশে হেলে পড়তে পারে। ভরা, সোজা পিঠ। পেছন থেকে মোহনাকে দেখে মতিভ্রম ঘটা স্বাভাবিক। তার পা, পায়ের গোছ ভারী, ভরন্ত, সুন্দর। মোহনার মুখ বুঝি তার চরিত্র। টানা লম্বা ধাঁচের মুখ, কাঠবাদামের মতন পুরু ও মসৃণ, গালের তলা ক্রমে ক্রমে গড়িয়ে নেমেছে, নেমে থুতনির কাছে নাসপাতির মতন নধর হয়ে গেছে। অথচ তার থুতনির ডৌলটি শক্ত, এক রকম কাঠিন্য লক্ষ করা যায়। ওর ঠোঁট যতটা পাতলা হলে মানানসই হত, তেমটা নয়, সামান্য মোটা, নীচের ঠোঁট বেশ পুরু; দাঁতের পাটি গোছানো। নাক হিসেবে মোহনার নাক আমার ভালই লাগে, বিসদৃশ লম্বা নয়, ডগা অল্পরকম ফোলা। ওর চোখ যে কেমন তা বুঝিয়ে বলা মুশকিল; কালো নয়নতারা, পালক খুব ঘন, দীর্ঘ; পাতলা টানা টানা ভুরু। মোহনার দৃষ্টি খুব সজীব, চঞ্চল; বিদ্ধ করার মতন ধারালো। ওর চোখে একটা সকৌতুক ভাব আছে, কিন্তু এই ভাব যখন থাকে না—তখন তার চোখের তারা এবং দৃষ্টি কি রকম রহস্যময় হয়ে থাকে, মনে হয় ওর সবই অনিশ্চয়তায় ভরা। আমার বরাবরই মনে হয়েছে, মোহনার চোখ তার চরিত্রের অনেকটা প্রকাশ করছে।

মোহনাকে আমি চুপচাপ লক্ষ করছি দেখে এবার অধৈর্যের ভান করে সে বলল, "কি রে, বলছিস না যে কিছু?"

"বলব। বলার আগে তোকে দেখছি।" হেসে বললাম।

মোহনা বলল, "আর কত দেখবি? তুই তো আর পাত্র নয়।"

মোহনার মুখোমুখি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম, "পাত্রী হিসেবে তুই এখনও সচল।" বলে হাসলাম। "তোর একটু বয়স হয়ে গেছে ময়না, তা হোক, অনেকে আজকাল খানিকটা বয়েস পছন্দ করে।"

ময়না তার গায়ের গরম উড়নিটা গলার কাছে পাক খাইয়ে নেবার মতন করল, বলল, "আহা রে, কি কথাই বললি···বয়স

হয়ে গেছে। বয়স না হয়ে গেলে কি তোর কাছে ধরনা দিয়ে বলতে আসতাম, একটা ওগো-টোগো খুঁজে দে।" ময়না মেয়েলী ভরাট গলায় হাসতে লাগল।

সিগারেট ধরিয়ে মুহূর্ত কয়েক মোহনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার এই রঙ্গময় হাসি দেখলাম। পরে বললাম, "তোর পাত্রের অভাব কি?"

ময়না কৃত্রিম বিস্ময় দেখিয়ে বলল, "অভাব না হলে তোর কাছে আসব? থাকলে কেউ চায়?"

"তোর অনেক ছিল।"

ময়না এবার হাসল না। তার গলার স্বর যদিও গম্ভীর হল না, তবু আগের মতন অতটা লঘুও থাকল না। বলল, "যাদের কথা বলছিস তারা আমার পাত্র নয়; হলে বিয়ে করে ফেলতাম।"

পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশায় ময়না বড় একটা কৃপণতা করেনি। তার সঙ্গে যারা মেলামেশা করত তাদের কাউকে কাউকে আমার মনে আছে।

আমার সংশয়ের ভাবটা মোহনা বুঝতে পারল। বুঝে জানলার দিকে সামান্য হেলে বিছানায় তার বাঁ হাতের ভর রাখল, অলস গলায় বলল, "দেখ ফুলদা, আমার বরাবরই একটু স্বয়ংবর সভা করার ইচ্ছে ছিল। আদ্যিকালের ব্যাপার হলে কি হবে, জিনিসটা বেশ। কত রাজাগজা, বীরটীর, দেবতা-দানব সভায় আসবে—আমি বেছে-টেছে নিজের মতন একটা বর খুঁজে তার গলায় মালা দিয়ে দেব, ব্যাস্—ঝামেলা চুকবে।" হাসিতে মোহনার কণ্ঠনালী কাঁপতে লাগল।

হেসে উঠে বললাম, "তুই তাহলে এতোদিন স্বয়ংবর করছিলি?"

"ঠিক বুঝেছিস—"মোহনা মস্ত করে ঘাড় হেলাল। স্বয়ংবর করেছিলাম। আজকাল তো আর সভা ডাকা যায় না, যারা আসে তাদের নিয়ে রাস্তায়, মাঠে, গঙ্গার ধারে, সিনেমায়, কিংবা ধর বাড়িতে

বসার ঘরে বসতে হয়। তা আমার বেলায় বুঝলি ফুলদা, রাজাটাজা আসে নি ; কোথা থেকে আসবে বল, পৃথিবী থেকে রাজাগজাগুলো মরে যাচ্ছে। তার বদলে ভাল মাইনের চাকরে-টাকরে এসেছিল, ব্যবসা করা গণেশ, স্কুলে-কলেজে পড়ানো হাঁদাটাদা, পাড়ার এক-আধটা কার্তিক।...দূর—এরা আবার পাত্র নাকি ? এদের সঙ্গে ঘোরাফেরা, হাসা-বসা করেছি, এরা বন্ধুটন্ধু, সঙ্গী ; ইয়ার-ক্লাসের লোক সব। এদের আবার কেউ নিজের থেকে বিয়ে করে !"

মোহনা যেন তার উচ্চ হাসির ঝাপটা দিয়ে সব ধুয়ে মুছে দিল।

হাসির দমক কাটতে আমারও কিছুটা সময় লাগল। সিগারেটের ধোঁয়া নিলাম গাল-গলা ভরতি করে। পরে বললাম, "তাহলে আর তুই স্বয়ংবরে নেই ?"

"না, আর নয়।"

আমি চুপ করেই থাকলাম। মোহনাও নীরব। জানলা দিয়ে শীতের রোদ এসে তার পিঠের আধখানা রৌদ্রময় করে রেখেছে, তার বাঁ হাতে রোদ পড়েছে, সোনার বালা ঝকঝক করছিল। তার কানের মুক্তো-পাথরটাও রোদ পেয়ে ঠিকরে উঠছিল।

মোহনা এবার তার মুখের ভাব, গলার স্বর একেবারে পালটে ফেলে বলল, "ফুলদা, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। অনেক কথা। আমার মন যে কি রকম হয়ে আছে তুই জানিস না।"

মোহনাকে আমি বুঝি, তার মুখ এবং কথার ভাবে বুঝলাম, সে কোনো ব্যাপারে অশান্তি নিয়ে আছে। বললাম, "বেশ তো, তোর মনের কথা বল।"

"না, এখন নয় ; এখানে নয়।"

"তবে ?"

"দু দিনের জন্যে কোথাও থেকে ঘুরে আসি চল। আমার ভাল লাগছে না আর।"

"কোথায় যাবি," বলেই আমার কিছু মনে পড়ল। বললাম,

"আমার এক জায়গায় যাবার কথা আছে। কাজ আছে একটা। ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে যেতে পারিস।"

"যেখানে খুশি চল। শুধু নিরিবিলি আর চুপচাপ চাই। তুই কবে যাবি আমায় জানাস। আমি পা উঠিয়ে আছি। বললেই যাব।"

দিন আট দশ পরে ময়নাকে নিয়ে আমি যেখানে এলাম সেখানে বড় কেউ বেড়াতে আসে না। কলকাতা থেকে ট্রেনে পুরো এক বেলার পথ। নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা। স্টেশনের কাছাকাছি পাহাড়ী টিলার তলায় এক সময় মিলিটারী ছাউনি পড়েছিল, এখন ওখানে ফায়ার ব্রিক্‌স্‌-এর কারখানা। কিছু দূরে কয়েকটা কয়লা কুঠি। অজস্র পলাশ ঝোপ আর বনতুলসীর জঙ্গল এখানে। কাছাকাছি এক ফালি নদী অজয় থেকে গড়িয়ে এসেছে।

কাজকর্মে আমায় এখানে বার কয়েক আসতে হয়েছে; এবারেও কিছু কাজ নিয়ে এসেছি। ভাবনা ছিল, আমার পুরোনো আশ্রয়টা পাব কি না। সৌভাগ্যবশে পেয়ে গেলাম। স্টেশনের কাছাকাছি একটা ছোট বাড়ি, মাথার ওপর শ্যাওলা ধরা টালির আচ্ছাদন, জানলা দরজা বোধ হয় জাম কাঠের। বাইরে সিমেন্ট বাঁধানো কুয়াতলা।

স্টেশনে নেমেই ময়নার জায়গাটা ভাল লেগে গিয়েছিল। এসে পৌঁছেছিলাম প্রায় দুপুরে। দেখাশোনা করার লোকটাকেও পাওয়া গেল। নাম তার দাশরথি। আমার সঙ্গে তার মুখ চেনাচেনি আগেই ঘটেছিল।

দাশরথি যাচ্ছিল কোলিয়ারীর দিকে তার ঘরের ডিম বেচতে,

আমাদের দেখে খুশী হয়ে অভ্যর্থনা করল ; বলল, "অনেক দিন বাদে এলেন বাবু, কাজে এলেন কি ? বউদিদিকেও নিয়ে এলেন ? ভালই করলেন।"

পৌষের মাঝ দুপুরের রোদ ময়নার ঠিক মাথায় পড়ছিল বলে সেই তপ্ত রোদ বাঁচাতে ময়না মাথায় খানিকটা কাপড় তুলে দিয়েছিল। দাশরথি অত বোঝে নি। বোঝার দরকারই বা কি ! আমি এবং ময়না দুজনেই পরস্পরের চোখে চোখে তাকিয়ে হাসলাম মৃদু।

দুটি মাত্র ঘর। দাশরথি ঘর খুলে ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে দিল। তক্তপোশ আর একটা পায়া-ভাঙ্গা টেবিল ছাড়া আসবাবের কোনো বাহুল্য নেই। দেওয়ালে কিছু পেরেক পোঁতা, একটা রাধাকৃষ্ণের ছবিঅলা পুরোনো ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারও ঝুলছিল।

দাশরথি গেল কিছু শুকনো খাবার আর চায়ের ব্যবস্থা করতে, ময়না গেল কুয়ার জলে অর্ধস্নান সারতে।

শাড়ি জামা ভিজিয়ে পরিষ্কার হয়ে ফিরে এসে ময়না বলল, "খুব আরাম লাগল, ফুলদা ; কুয়ার জল যে এত মিষ্টি কে জানত !" বলে ময়না কাপড় ছাড়তে পাশের ঘরে গেল।

পাশাপাশি ঘর, মাঝখানে পলকা দরজা। দাশরথি একটা ঘরই খুলে দিয়েছিল, পাশের ঘরের ছিটকিনিটা আমিই খুলেছি, ময়না দাশরথির রেখে-যাওয়া ঝাঁটা দিয়ে ঘরটা আগেই একটু পরিষ্কার করে নিয়েছে।

দাশরথি ফিরে আসতে আসতে আমারও হাতমুখ ধোওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর চা জলখাবার খেতে বসলাম। ততক্ষণে প্রায় বিকেল।

আমি ভেবেছিলাম, ময়না ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আজ আর বাইরে যেতে চাইবে না। বিকেল পড়ে যাচ্ছে দেখে ময়না বলল, "চল ফুলদা, একটু ঘুরে আসি বাইরে থেকে।"

দরজায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দাশরথি বলল, "যান

ঘুরে আসুন, আমি আছি।" এই বাড়ির লাগোয়া একটা খাপরা-ছাওয়া বাড়িতে সে থাকে।

শীতের বিকেল, এই ছিল দাঁড়িয়ে, হঠাৎ পালাল কোথাও, আর তার দেখা নেই ; আর প্রায় দেখতে দেখতে আঁধার হয়ে এল। শীতের বাতাস এখানে উদ্দাম, কোথা দিয়ে ছুটে আসছে বোঝাও যায় না, কখনও মনে হয় জঙ্গলের দিক থেকে, কখনও মনে হয় নদীর ধার ঘেঁষে। বনতুলসীর গন্ধ আরও ঘন হয়ে নাকে লাগে। ফায়ার ব্রিক্স্-এর ধোঁয়া পাহাড়ী টিলার মাথায় মেঘের মতন জমতে থাকল। ততক্ষণে তারা উঠে গেছে আকাশে, চারপাশ কালো, হিম পড়ছে। স্টেশনের দিকে কয়েকটা দোকানপত্রের আলো জ্বলছে টিমটিম করে। শীত ধরে গিয়েছিল ময়নার, বলল, "চল, বড্ড হাওয়া বাপু, গা কাঁপিয়ে দিচ্ছে।"

ঘরে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে ঘন হল।

দাশরথির দেওয়া লণ্ঠন নিয়ে আমি বসলাম। ময়না তোলা জলে হাত পা ধুয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে সটান তক্তপোশের ওপর বসে পড়ল। আমার বিছানাটা ও-ঘরে। বিছানায় বসে ময়না তার গায়ের র‍্যাগ কোলের ওপর টেনে নিল। "এই রকম শীত পড়লে মরেই যাব রে ফুলদা, বাব্বা!"

"মরবি না ; বোস চাপাচুপি দিয়ে, গরম হয়ে যাবি।"

"তুই না তোর ফ্লাস্ক ভরতি করে চা আনলি স্টেশন থেকে। দে, গরম চা খেয়ে গলার ব্যথা সামলাই।"

কুয়ার জল বোধ হয় একটু বেশিই ঘেঁটেছিল ময়না, তারপর বাইরের বাতাসে সামান্য ঠাণ্ডাই লেগেছে ; গলা ব্যথা ব্যথা করছিল। ফ্লাস্ক ভরতি করে চা এনেছিলাম স্টেশন থেকে, দাশরথি এ জিনিসটা যখন তখন দিতে পারে না।

ময়নাকে চা দিয়ে নিজের গ্লাসটাও ভরতি করে নিলাম। আরও থাকল ফ্লাস্কে। আমাদের নিজস্ব বাসনপত্র বলতে ওই দুটো কাঁচের

গ্লাস, জলটল খাওয়ার জন্য বয়ে এনেছি। দুজনের দুটো ছোট বিছানা, দুটো স্যুটকেশ, আর ছোট মতন একটা বেতের টুকরিতে একটা টিফিন কেরিয়ার, কয়েকটা কমলালেবু, এক প্যাকেট মোম-বাতি, কিছু টুকিটাকি।

দাশরথি এর মধ্যে একবার দরজার কাছ থেকে ঘুরে গেল। ন'টার গাড়ি আসতে আসতে তার খাবার তৈরি হয়ে যাবে। বললাম, "তার পরে হলেও আমাদের অসুবিধে হবে না, খাবার সময় হলে তাকে ডাকব।"

লণ্ঠনটা ভাঙা টেবিলের ওপর জ্বলছে, ময়লা, মেটে রঙের আলো। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট ধরালাম, ধরিয়ে ময়নার মুখোমুখি বসলাম। পা ঝুলিয়ে বসা যাচ্ছিল না, ঠাণ্ডা লাগছে; বিছানায় পা উঠিয়ে নিলাম। জানলা দরজা বন্ধ, তবু ফাঁক-ফোকর দিয়ে কনকনে বাতাস আসছিল।

ময়না আরাম করে ধীরেসুস্থে চা খাচ্ছিল। আমি কখনও ময়নাকে দেখছিলাম, কখনও ঘরের ধুলো-জমা দেওয়ালের গায়ে ঝাপসা আলো, কখনও বা পাশের ঘরের অন্ধকার দরজাটা দেখছিলাম।

ময়না এবার ঢোঁক গিলে আরামের শব্দ করল একটু, বলল, "গরম লাগিয়ে ব্যথাটা যেন কমলো খানিক।"

"অবেলায় তুই অত জল ঘাঁটলি কেন! কলকাতার মানুষ, কুয়া দেখে নেচে উঠলি।"

কথাটা শুনল ময়না। তারপর কি মনে করে হেসে ফেলল। বলল, "অবেলায় বুঝি কিছু ঘাঁটতে নেই রে?"

ময়নার চোখের দিকে তাকালাম। কথাটা সে অন্যভাবে বলেছে। কি ভেবে বলেছে আমি তার খানিকটা অনুমান করতে পারি। ওর চোখে অন্যমনস্কতা ফুটে উঠেছে। আমায় সে দেখছিল না, আমার পাশ দিয়ে মলিন আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলা গেল না। অথচ এই কিছুক্ষণের মধ্যে এমন একটা নীরবতা সৃষ্টি হয়ে উঠল যা আমাদের বোধ ও অনুভূতির মধ্যে কোনো গভীর উন্মনার ভাব সঞ্চার করছিল। ময়নার চোখের পাতা স্থির, দৃষ্টি এলোমেলো, যেন কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। বিগত কোনো কোনো ঘটনা আমায় উদাস করছিল।

শেষে অনেকটা হালকা গলায় আমি বললাম, "তুই তো অবেলাই পছন্দ করলি।"

ময়না তাকাল না, একই ভাবে বসে থাকল।

অপেক্ষা করে আবার বললাম, "তোর এখনও একেবারে অবেলা হয় নি, খানিকটা বেলা আছে···।"

এবার ময়না আমার দিকে তাকাল। আমার পরিহাস সে মন দিয়ে শুনেছে কি শোনেনি বোঝা গেল না। চোখের পলক ফেলল। বলল, "আর কতটুকু আছে তুই জানিস? জানিস না।" ময়না মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে।

না জানার মতন আমি কিছু পাচ্ছিলাম না। ময়নার হয়ত সামান্য বয়স হয়ে গেছে; কিন্তু সে কিছু না। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সিগারেটের এক মুখ ধোঁয়া গলায় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকলাম। পরে ঠাট্টা করে বললাম, "তোর তো সবটাই আছে। সেদিন বাড়িতে এসে চুল দেখালি, দাঁত দেখালি, নিজেই বললি হাত-পা এখনও নরম।"

ময়না এবার ঠোঁটের ডগায় হাসির ভাব আনল একটু, বলল, "মিথ্যে বলেছি?"

"না, কে বলল মিথ্যে বলেছিস?"

"ওগুলো মিথ্যে নয়, বুঝলি ফুলদা—" ময়না কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে হঠাৎ কি রকম অন্যমনস্ক হল, তার চোখের দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে মিশে গিয়েছিল, তবু সে আমাকে দেখছিল না। মুহূর্ত কয়, তারপর আবার ময়না স্বাভাবিকভাবে আমায় দেখতে দেখতে নিশ্বাস

ফেলল। বলল, "বাইরে সব ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে কি যেন একটা হয়ে গেছে রে ফুলদা।"

ওর দিকে সপ্রশ্ন সকৌতুক চোখ করেই বললাম, "কি হয়ে গেছে? বল শুনি।"

ময়না তার কালো গরম শাল আরও ঘন করে নিয়ে বলল, "তুই কিছু বুঝিস না? একটা আন্দাজ কর না।"

মনের আন্দাজ যাই হোক মুখে হেসে বললাম, "আমি কি বুঝব! আমি শুধু দেখছি তুই আমায় একটা বিয়ের পাত্র খুঁজে দিতে বলছিস।"

ময়নাও হাসল। "তা বলেছি—।"

আমার চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, গ্লাসটা জানলার দিকে হাত বাড়িয়ে রেখে দিলাম। সিগারেটও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ময়না তার দু পা উঁচু করে হাঁটু ভেঙে বসল, তার কোমর পর্যন্ত কম্বল চাপা; যদিও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না তবু বুঝতে পারছিলাম ময়না তার দু হাত পায়ের দু দিক দিয়ে বেড় দিয়ে হাঁটু বুকের সামনে টেনে নিয়ে তার চিবুক রাখল।

ময়নার মাথার চুল রেলের ধুলো ময়লায় সামান্য রুক্ষ হয়ে আছে। কপাল আর কানের পাশের আলগা চুলগুলো কিছু এলোমেলো, নীচের পুরু ঠোঁটে সকালের পানের বাসি খয়েরী দাগ।

"পাত্র খোঁজার আগে পাত্রীর কথা কিছু শুনি—" আমি সাধারণভাবেই বললাম, কৌতুক করেই, "তুই না বলেছিলি তোর অনেক কথা আছে—!"

ময়না হাঁটুর ওপর চিবুক রেখেই চোখ তুলে কয়েক পলক আমায় দেখল। বলল, "হ্যাঁ কথা আছে।"

সিগারেটের টুকরোটা এবার নিবিয়ে ফেলে দিলাম। "বল শুনি।"

আমি এবার খানিকটা আলসামির ভাব করে বসলাম। ময়নার

কম্বলের অনেকটা বাড়তি পড়ে আছে, পায়ের খানিকটা ঢেকে নিলাম।

ময়না চুপচাপ। হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে চোখ নীচু করেই বসে আছে।

খানিকটা সময় অপেক্ষায় কাটল। তারপর আবার বললাম, "কি রে, বল।"

ময়না প্রথমে বিড়বিড় করে কি বলল, মনে হল যেন বলছে, "বলছি—বলছি, অত তাড়া দিস না।" তারপর মুখ তুলে নিশ্বাস টেনে বলল, "বলার আগে একটা কথা তোকে বলি ফুলদা, আমার কথা তুই নিজেই বুঝিস, আমি অতশত বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

মজার গলায় বললাম, "গৌরচন্দ্রিকা ভালই হচ্ছে, তুই চালিয়ে যা।"

"দূর, এটা গৌরচন্দ্রিকা কেন হবে," ময়না বলল, "আমার কোনো চন্দ্রিকাটন্দ্রিকা নেই। তবে একটা জিনিস আছে ; দাঁড়া বের করে আনি।" বলে কম্বলের তলা থেকে পা টেনে বাইরে আনল ময়না। তার পায়ের কাপড় সায়া অগোছালো করেই তক্তপোশ থেকে নামল। তারপর দেখলাম মেঝেতে বসে অন্ধকারে কি যেন খুঁজছে। একটু পরেই ময়না তার সুটকেস বের করে নিয়ে চাবি খুলে ডালা তুলল। সামান্য হাতড়াল ময়না, আবার সুটকেস বন্ধ করে তক্তপোশের আড়ালে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিছানায় বসবার আগে গায়ের শাল মাথার দিকে সামান্য তুলে আবার কম্বলের মধ্যে তার পা কোমর ডুবিয়ে দিল। ডান হাতে কি একটা জিনিস। কৌতূহল বোধ করলেও বুঝতে পারলাম না জিনিসটা কি। মনে হল পাতলা খয়েরী রঙের এক টুকরো চামড়া। ঠিক যে খয়েরী রঙ তা নয়, অনেক পুরোনো হয়ে যাওয়ায় এবং হাতে হাতে ময়লা ধরায় ওই রকম একটা রঙ হয়েছে। বিঘতটাক লম্বা

হয়ত অথচ গোল রুলের মতন। মনে হল, গোল করে গুটিয়ে রাখা হয়েছে।

"ওটা কি রে?" অবাক হয়ে শুধোলাম।

ময়না জিনিসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল না, দেখতেও বলল না—তার ডান পাশে পেছনে পিঠের দিকে সরিয়ে রাখল। ময়নার আড়াল পড়ায় ওখানটায় লণ্ঠনের আলো নেই, ছায়া গাঢ় হয়ে আছে।

আবার শুধোলাম, "ওটা কি?"

ময়না বলল, "ওই থেকেই আমার শুরু। ধরে নে ওটা আমার জীবন।"

তার এই হেঁয়ালিভাব আমি বুঝলাম না। ময়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তার সুশ্রী মুখে পাতলা হাসি ছিল, সেই হাসি ক্রমেই যেন মুছে গিয়ে গম্ভীর হয়ে আসছিল। কপালের চুল হাতের উলটো পিঠ দিয়ে সরিয়ে কপাল পরিষ্কার করল ময়না, আঙুলের ডগা দিয়ে চোখ রগড়াল। চোখ রগড়াবার পর তার চোখ সামান্য ছলছলে হল। অনেকটা বাতাস টানল শব্দ করে, মুখ বুজে; বুক ফুলে উঠল, তারপর মুখ হাঁ করে নিশ্বাস ফেললে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল।

"ওই কিসের একটা টুকরো—চামড়ার না কাগজের—তোর জীবন হল কি করে?" হাসির গলায় বললাম।

"হল। কেমন করে হল, তোর জেনে লাভ কি!" ময়না বলল, "হাসির কথা নয়। আমিও ভেবেছিলাম এটা আবার আমার জীবন কিসের! আমিও হেসেছি, ঠোঁট উলটেছি, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু সত্যি ফুলদা, একদিন দেখলাম, ওটা আমার জীবন।" ময়নার মুখ গম্ভীর, গলায় অল্প আবেগ।

মানুষের কোন কথা কি যে ব্যক্ত করে জানি না। ময়নার এবারের কথায় আমার মধ্যে হাসি ও লঘুতার ভাব কমে গেল। আমি ওর মুখ দেখে অনুভব করতে পারছিলাম, নিছক হেঁয়ালি নয়।

মোহনার কোথাও যেন একটা সত্য আছে, সে কোনো কিছুর ইঙ্গিত দিতে চাইছে। আমার অবিশ্বাস বা প্রশ্ন তাকে হয়ত বিরক্তই করবে। নীরবই থাকলাম, কৌতূহল হচ্ছিল—মোহনা কি বলে ?

মোহনা বলল, "দেখ ফুলদা, মানুষ নাকি কতরকম ভাবনা চিন্তা করে। আমার অত ভাবনাটাবনা আসে না। পারি না। তবু তুই না চাইলেও কখনো কখনো ভাবতে তো হয়ই। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের মধ্যে অনেক জিনিস থাকে, কিছু ওপরে ভাসে, কিছু থিতিয়ে থাকে। জোরে নাড়া পড়লেই থিতোনো জিনিসগুলো ওপরে ভেসে ওঠে।···ঠিক কি না বল ?"

"ওই রকমই—।" আমি মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম।

অল্প চুপ করে থেকে মোহনা বলল, "আমার মধ্যে খুব যে কিছু থিতিয়ে ছিল আমি বুঝতে পারতাম না। যেগুলো ভাসত সেগুলোই আমি বুঝতাম। তুই দেখেছিস ছেলেবেলা থেকেই। আমি আমার মতন। লোকে বলত বেয়াড়া, জেদী, ধিঙ্গী ; বলত, আমি নিজেকে নিয়েই থাকি, স্বার্থপর, আত্মসুখী। ছেলেবেলা থেকেই দিদির সঙ্গে আমার ঝগড়া, দিদিকে আমি আমার ওপর মোড়লি করতে দিতাম না, তার সঙ্গে সব ব্যাপারেই সমান ভাগ বাঁটরা করে নিতাম। কিন্তু সেটা পাবার বেলায়, দেবার বেলায় নয়. কাজের সময় নয়। মা আমাকে অবাধ্য বলত ; বলত, আমার যত বয়েস বাড়বে আমি ততই বেয়াড়া হয়ে উঠব, আমার স্বভাব মন্দ হবে, আমি যেখানে যাব সেখানেই ঘর জ্বালাব। বাবা এত কথা বলত না প্রথমে, পরে বলত যে, আমায় একটু বেশি রকম আসকারা দেওয়া হয়ে গেছে, এখন বাঁধতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে পালাব। এসব হল ঘরের কথা ; তুই সবই জানিস। আমি যা শুনেছি কান দিয়ে বের করে দিয়েছি। আমি আমার মতন হয়ে থাকলাম। তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকেই পাড়ার মেয়েদের চোখ টাটাতে লাগল। ছেলের দল তখন থেকেই আমার জন্যে গলিতে জটলা পাকাতে লাগল। আমার তাতে কোনো

লজ্জাটজ্জা হত না। একবার সেই সরস্বতী পুজোর দিন পাড়ার মধ্যে দু' দল ছেলের মধ্যে মারপিট হল তোর মনে আছে? আমায় নিয়ে কেস্ছা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি কিছু জানি না। মিথ্যে কথা, আমি জানতাম। লাহাদের বাড়ির ছেলে—কি যেন নাম ছিল রে তার—মনেও নেই, সেই ছেলেটা আমায় পটাচ্ছিল, অন্য দলের ছেলেরা জানতে পেরে মারধোর লাগিয়ে দিল। আমার তাতে বয়েই গেল। সোজা কথা, ওই বয়স থেকেই আমি বুঝলাম আমার একটা দাম আছে। আমার দাম যে ছিল তুইও জানিস্। আমার যখন বয়স ষোলো সতেরো—তখন তুই আমায় কি বলতিস, ফুলদা?"

"বোরখা পরতে..."

"না; সে আরও আগে; সবে যখন শাড়ি ধরেছি।"

"শাড়ি ধরারও বেশ পরে তোকে আমি 'মোহ' বলে ডেকেছি।"

"হ্যাঁ। শুধু ডাকিস নি, তুই আমার প্রেমিক হয়েছিলি।"

"হয়েছিলাম।"

"তোর সঙ্গে আমার খুব একটা লুকোচুরি খেলা কখনও হয় নি। আমি পারতাম না; আমার স্বভাবও তেমন ছিল না। তুই আমার কাছে হাত বাড়ালেই পেয়েছিস। তোকে আমার বরাবরই ভাল লেগেছে ফুলদা; তুই আমার ধাত বুঝিস, স্বভাবও বুঝিস। তুই বুঝতে পেরেছিলি আমার বাঁধাবাঁধি বলে কিছু নেই। আমি একটা কিছু খুঁটি পেলেই তার গা জড়িয়ে বাড়ব এমন লতাগাছ নই। তেমন হলে আমার হাতের কাছে তুই ছিলি, আহা, কত ভালই না বাসতিস, তোতে আমাতে ঢুম করে গিয়ে বিয়ে করে আসতুম। কেউ আটকাতে পারত না। সেই তোকেও আমি পাশ কাটিয়ে দিলাম। অবশ্য তোর রাগ, হিংসে, আফসোস শেষের দিকে কমেই এসেছিল। তুই খুব চালাক, ধরতে পেরে গিয়েছিলি—আমার প্রেম ভালবাসায় মতি নেই।" মোহনা স্নিগ্ধ করে হাসল একটু, যেন সে একটু দুঃখই পাচ্ছে আমার জন্যে, পেয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

আমি বললাম, "আমার কথা থাক, তোর কথাই বল।"

"বলছি, বলছি—" মোহনা তার কানের লতিতে হাত দিয়ে মুক্তো পাথরটা ঠিক করে নিল, হয়ত আলগা করল। বলল, "আমায় অত তাড়া দিস না, এক বলতে আরেক বলে বসব। আমি ছাই গুছিয়ে কি কিছু বলতে পারি! যাক শোন—যা বলছিলাম। আমি বলছিলাম যে, আমার স্বভাবটাই ছিল অন্যরকম। কোনো কিছুই আমি শেষ বলে নিই নি, নিতে পারতাম না। তুই বিশ্বাস কর, আমি সত্যি সত্যি কোনোদিন কোনো ছেলেকে বাছি নি। তোকে সেদিন ঠাট্টা করে বলছিলাম বটে যে, আমি স্বয়ংবর সভা করছিলাম, কথাটা কিন্তু ঠাট্টাই। না রে ফুলদা, আমি বাছবিচার করি নি। কেন করব বল? আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কাউকে শুইয়ে-বসিয়ে হাত করব এমন কথাই আমি ভাবতাম না। আর তা যদি হবে তবে আমি অমিয়বাবুকেই আমার হাতের মুঠো খুলে সম্মতিটা বাড়িয়ে দিতে পারতাম। তুই অমিয়-বাবুকে চিনিস। কি রকম কাজেকর্মে তৎপর ছেলে বল। ছিল এখানকার মিউজিয়মে, চলে গেল দিল্লির খাস অফিসে। গভর্নমেণ্ট তাকে দু' দুবার বিদেশ পাঠাল। তারপর, আমাদের দীপককে, টেক্সটাইলের পাস করা ছেলে, আমাদের অফিসে এসে বসতে না বসতেই ছমাসের জন্যে আমেরিকা। ফিরে এসে বলল, বেল্ট না আঁটলে ট্রাউজার্স পরতে পারি না, ফ্যাট হয়ে গেছে। দু লাফে বড় চাকরি বগলে পুরে আবার যেন কোথায় চলে গেল। পয়মন্ত ছেলে। আমায় বলেছিল, লেট্ আস্ সেটেল্ সামথিং। আমি বলেছিলাম, নাথিং। ঘা খেয়ে দীপক আমায় ঘেন্নাই করে বসল। তা করুক। তারপর আরও কত এল: বিজন, কমলেশ, সান্নু সোম— এরা বিয়ের বাজারে কলকাতার ট্যাক্সির মতন, হুট করে পাওয়া যায় না।...সজ্জন মানুষ, বিদ্যেবুদ্ধির বহরে মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, কলেজের এক প্রফেসারও এসেছিল; স্কুলের মাস্টার—ডানপিটে

একটা ছোকরাও জুটেছিল। কত বলব তোকে। এদের কাউকেই আমি আমার খুঁটি করতে চাই নি। ইচ্ছেও হয় নি।" মোহনা থামল। তার বোধ হয় একটু জিরিয়ে নেবার দরকার হয়েছিল, কিংবা যেদিকে তার কথা গড়িয়ে চলেছে সেদিক থেকে থামিয়ে নেবার।

মোহনার চোখমুখ সামান্য চকচক করছিল। বলার ঝোঁকে কিছুটা আবেগ ও অস্থিরতা তার এসেছে; সেই উত্তেজনা বোধ হয় চোখে মুখে ভাসছিল।

আমি বললাম, "তোর ইচ্ছেটা কি ছিল?"

মোহনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। বার কয়েক সে ছোট বড় নিশ্বাস নিল। তারপর বলল, "আমার ইচ্ছে আমার মধ্যেই ছিল, বোধ হয় জন্মকাল থেকেই। আমি নিজের ইচ্ছেকেই কতবার শুধিয়েছি—হ্যাঁ রে, তোর মতলব কি? হাসিস না ফুলদা, সত্যি বলছি, এক-একদিন, যখন আর কিছু মাথায় থাকত না, একেবারে ফাঁকা হয়ে থাকতাম—তখন, বা যখন আমার সঙ্গে কারও বন্ধুত্ব মেলামেশা শেষ হয়ে যেত, আমার ওপর আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে কমলেশ টমলেশরা চলে যেত—তখন রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজের ইচ্ছেকেই নিজে শুধোতাম, তোর ইচ্ছে কি? আমরা সবাই একটা মানুষ, কিন্তু তুই দেখিস মাঝে মাঝে আমরা দুটো হয়ে যাই, বাইরে যে থাকে সে ভেতরের মানুষটাকে চুপি চুপি এ-সব কথা জিজ্ঞেস করে। আমি ভাই, মনটাকেই একটা মানুষ বলি—ভেতরের মানুষ। তুই কোনো দিন তার গোটা চেহারা দেখতে পাবি না, তাকে ভাল বুঝবি না, অথচ সে তোকে আড়াল থেকে যে চালিয়ে নিয়ে কোথায় যাবে তুই জানিস না। আমি অনেকদিন রাত্রে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করেছি, কি তোর ইচ্ছে? কখনও স্পষ্ট কোনো জবাব পাই নি। ...তবু আমার মনে হত আমার ইচ্ছে অন্যদের মতন নয়। দেখে শুনে, সাত পাঁচ ভেবে, লাভলোভ খতিয়ে দেখে একটা ছেলেকে বিয়ে করে ফেলব—সে-রকম ইচ্ছে আমার হত না। আমি, জানিস

ফুলদা, একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, আমি একটা গয়নার বাক্সের মতন হয়ে বিজনের আলমারির লকারে ঢুকে গিয়েছি, বিজন লকার বন্ধ করে দিচ্ছে। উরে বাব্বা, সে কী ভয় আমার, গলা শুকিয়ে কাঠ, ঘামতে ঘামতে মরি, ঘুম ভেঙে গেল। তারপর আর সারারাত ঘুম নেই। পরের দিন সারাক্ষণ সেই একই স্বপ্ন আমায় খোঁচাতে লাগল। সহজে আর সেটা ভুলতে পারি না। শেষে বিজনকে এড়িয়ে গিয়ে তবে বাঁচি। তাই বলছি তোকে, আমার ইচ্ছেটা কি —আমি কোনদিন জানতে পারি নি, কিন্তু বুঝেছিলাম—আমি কোনো অবলম্বন চাই না, বন্দী অধিকারের মধ্যেও থাকতে পারব না। আমার সঙ্গে যাদের অনেক দিনের মেলামেশা হয়েছিল—আমি তাদের কারও জন্যে ছটফট করতে পারিনি, মনেই হয় নি ও বা অমুক না থাকলে আমার সব অন্ধকার হয়ে যাবে, আমি আর বাঁচব না! যখন কেউ চলে যেত মামুলি একটু-আধটু মন খারাপ ছাড়া কারও জন্যে আমার দুঃখ হত না। অল্পসল্প মায়া ছাড়া সত্যিই আমার ওদের জন্যে কোনো ব্যাকুলতা ছিল না। এই তো, সেবার প্রমথ রাত না পোয়াতে মারা গেল। সবাই কাঁদল, হা-হুতাশ করল, দুঃখ পেল; আমারও মনটা খারাপ লাগছিল, কিন্তু প্রমথ নেই—আমার কি করে জীবন কাটবে এ সব আমি ভাবতেও পারলাম না। দুঃখ-শোকে আমি অধীর হলাম না। আমার কাছে কিছুই ফাঁকা ঠেকল না।" মোহনা চুপ করে গেল।

কিছু সময় আমি একইভাবে বসে থাকলাম। মোহনার চোখ-মুখ এখন আর আলাদা করে আমার নজরে আসছিল না, যেন ওর সমস্ত মুখ আমার দৃষ্টিপটে ছবির মতন স্থির হয়ে গেছে। মোহনা সামান্য নড়াচড়া করল। আমার তন্ময় ভাবটা তখন কাটল। নিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে আবার একটা সিগারেট ধরালাম।

মোহনা মাথা নামিয়ে শালের গায়ে তার নাকের ডগা ঘষল একবার, ছোট্ট করে হাই তুলল। এবার লক্ষ করে দেখলাম,

মোহনার চোখ-মুখ গম্ভীর হলেও তার মধ্যে কেমন এক ব্যাকুলতা এসেছে। আবেগে তার চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে এসেছে।

কি যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, মোহনা বাধা দিল। বলল, "তুই বলবি, আমি নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, আত্মসুখী। বলতে পারিস আমি হৃদয়হীন। এ-সব নতুন কথা নয়; মা বলেছে কোটি বার, বাবা বেচারী মারা যাবার আগেও আমায় বলেছে—আমি আমাদের পরিবারের মানসম্মান বলে কিছু আর রাখি নি। দিদি আমায় তার শ্বশুরবাড়িতে কোনোদিন ডাকে না, ঘেন্না পায়, বলে আমার তার কোন ভাবতে গা গুলিয়ে ওঠে। আমার ছোট জ্যোতি, সেদিন সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরি শুরু করেছে, সেও সেদিন চোটপাট করে বলল, আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে তার ঘেন্না হয়।···শোন ফুলদা, আমি সব স্বীকার করে নিচ্ছি, যে যা বলেছে; এমন কি আমার জামাইবাবু যে বলেছিল আমার মধ্যে বিকার ও রোগ আছে—আমি তাও মেনে নিলাম। কিন্তু তুই বল, আমার দোষ কোথায়? পাঁচজনের শেখানো কথায় আমার যদি রুচি না থাকে আমি কি করতে পারি! এই সংসারে তুই দেখবি, পাঁচজনে তোকে শুধু শেখাচ্ছে—এটা কোরো না, এটা মন্দ ওটা ভাল, এরকম করলে লজ্জায় মাথা নীচু হবে, ওটা করো—করলে ভবিষ্যতে ভাল হবে। দূর ভাই, ও শিক্ষা যদি আমার ভাল না লাগে কি করব আমি। জীবনটা আমার। আমার নয়? এই শরীর বল, মন বল সবই তো আমার। আমার যদি নিজের শরীর নিয়ে মনে না হয় যে আমি চোর, তবে আমি কেন তাকে নিয়ে কোথায় রাখি, কোথায় বন্দি করে ভয়ে মরব। আমি কি চুরি করে আমার দেহটা এনেছি? এ আমার জন্ম থেকেই। কেন আমি নিজের জিনিস নিয়ে পথ হাঁটতে ভয় পাব? না না, আমার ভয়টয় ছিল না। বরং আমি ভাবতাম ওই জিনিসটা আমার সম্পদ। তুই দেখিস ফুলদা, আমাদের সংসারে সব সম্পদেরই কদর আছে, তাকে ফলাও করে

বেড়ালেই লোকে খুশি হয়। তোর যদি গাড়ি-বাড়ি থাকে তুই কি লজ্জায় মরবি, তোর যদি বংশমর্যাদা থাকে তুই কি ইঁদুরের গর্তে ঢুকিস? লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট হলে তার কদর, গানের গলা থাকলে তারও কদর, মস্ত চাকরি করলে তারও কদর। শুধু তোর যদি এমন একটা শরীর থাকে যা ভাল, যার জন্যে—কি বলব, সেই যে পদ্যটা—'পরিমল লোভে অলি সকলি জুটিল'—তবেই শুধু ছি ছি। ...আমি ভাই এ-সব বুঝতে পারতাম না। আমার মনে হত যা পেয়েছি সে আমার নিজের ধন, আমার সম্পদ, আমার জিনিস নিয়ে আমি মাথা উঁচু করে চলব, যা খুশি করব, তাতে অন্যের কি! তা বলে আমি কি অত বোকা যে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খইমুড়ি ছিটোনোর মতন করে যত রাজ্যের কাকপাখি জুটিয়ে এনে নিজেকে খাওয়াব। অত বোকা আমি নই। আমার সুখ যতটুকুতে ততটুকু আমি নিয়েছি। আমার কোনদিন আফসোস হয় নি, বুক ধকধক করে নি।" ময়না থেমে গেল, যেন সে কোনো উঁচু জায়গা থেকে তরতর করে নামতে নামতে এসে হঠাৎ দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে থমকে গিয়ে আরও নীচের দিকে তাকাল, দেখল—এবার তাকে পা ফেলতে হবে সাবধানে। রীতিমত সতর্ক ও বিচক্ষণ হয়ে যেন পরের পা ফেলছে এইভাবে মোহনা বলল, "তারপর—একদিন..."

হাতের সিগারেটটায় ছাই জমেছিল, আঙুল সরাতে গিয়ে ছাই কম্বলে পড়ল, পড়ে তার বাঁকা চেহারাটা ভেঙে দুদিকে ছড়িয়ে গেল।

মোহনা বলল, "তারপর একদিন হঠাৎ কেমন সব হয়ে গেল। বলতে পারিস উলটে পালটে গেল।" মোহনা শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার চোখের তারা বিষণ্ণ ও কাতর হল, কিছুটা উদাস। "একদিন কি যে হল বুঝলাম না। দিনটাই ছিল খারাপ। সকালে কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম কে জানে, ঘুম ভেঙে উঠতে না উঠতেই মার সঙ্গে খিটিমিটি বাঁধল। আমার ওপর মার মানব

ভাবটা তুই জানিস। কথা কাটাকাটি আমাদের নতুন নয়, প্রায়ই হয়। কিন্তু সেদিন মার মন একেবারে তেতো হয়ে ছিল। কি যে বলল আর না বলল তার কোনো ঠিক নেই। বুঝলাম, জ্যোতিই মাকে উসকে দিয়েছে। জ্যোতির সঙ্গেও আমার ঝগড়া হল, আমারও মুখের ঠিক থাকল না, যা-তা বললাম। ঝিয়ের বাচ্চ ছেলেটা বাঁদরামি করছিল, ঠাস করে এক চড় মারলুম, ছেলেটা ককিয়ে মরে আর কি। তিতিবিরক্ত হয়ে স্নান নেই, খাওয়া নেই, চলে গেলাম অফিস। অফিসে কোথায় একটু স্বস্তিতে থাকব তা নয়, মেঘলা দুপুরে এক মূর্তিমান এসে হাজির। আমার এই নতুন মূর্তিমানটিকে তুই চিনিস না, এর নাম ললিত। নামে ললিত হলেও ওর কোথাও তেমন লালিত্য নেই, চেহারাটা লম্বাচওড়া, পুরুষের মতন, স্বভাবটা রুক্ষ, অহমিকা বেশি। অফিসে এসে আমায় জোর জবরদস্তি করে টেনে নিয়ে রাস্তায় বেরোলো। তারপর নিয়ে গেল পার্ক স্ট্রীটের এক চীনে দোকানে। ভেবেছিলাম, খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু নেশার মধ্যে আমায় ছেড়ে দেবে। ওমা, ছেড়ে দেবে কি, পকেট থেকে কাগজ বের করে এগিয়ে দিল, বলল, নোটিশ। ওর উদ্দেশ্য বুঝলাম। কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে বললাম, না—না, এ সব হয় না। ও বলল, কেন? আমি কেন-টেনোর পথ মাড়ালাম না। কিন্তু ও একেবারে নাছোড়বান্দা। আমার না ও শুনবে না। বিকেল হয়ে গেল, বৃষ্টি নামল ঝিপঝিপ করে, সেই বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি নিয়ে চলল ডায়মণ্ডহারবার। আমায় সারাক্ষণ শুধু বোঝাতে চাইল, আমায় না হলে ওর চলবে না। কী মুশকিলেই পড়লাম! মদের গন্ধ আমার অজানা নয়, মাতলামি আমি বুঝি; কিন্তু লোকটা ক্রমেই জবরদস্তি শুরু করেছে। আমার বিরক্তি লাগছিল। এমনভাবে কেউ আমার পথ আটকাতে আসে নি, অথচ ওর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা আমার অন্য অনেকের সঙ্গেই হয়েছিল। ললিতকে আমার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। ওর

জবরদস্তি দেখে এবং ভাবসাব বুঝে আমার মনে হল, লোকটা আমায় উপার্জন করতে চায়, করে তার নিজের অ্যাকাউণ্টে আমায় জমা করে ফেলতে চায়। তাতে তার তহবিল যেন মোটা হবে। কিন্তু আমার কি হবে? আমি তো তার গচ্ছিতের মধ্যে গিয়ে পড়ব। ও আমায় আয়ত্ত করবে, অধিকার করবে, সেই অহমিকায় খুশি থাকবে। আর আমি? আমার কি থাকবে?…আমি ওকে হাজারবার না না করলুম, কতবার পাঁচ কথায় বোঝাবার চেষ্টা করলুম। ভবি ভুলল না। শেষে ওর নোংরা চেহারাটা বের করতে লাগল। আমায় ও শাসাতে লাগল। ওর শাসানি আমার খারাপ লাগল। তখন বুঝি নি, গ্রাহ্যও করি নি। আকাশে মেঘ গুড় গুড় করলেই কি ভয়ে কাঁটা হয় মানুষ!…শেষে সন্ধ্যেবেলায় আমায় বাড়ি পৌঁছে দিতে এল। কেন এল তা কি বুঝতে পেরেছিলাম তখন! একটু পরেই ওর আসল উদ্দেশ্যটা বুঝলাম। আমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে শয়তানটা গলা বড় করে বলে গেল, আমার পেটে তার বাচ্চা রয়েছে।"

কথাটা বুঝেও না বোঝার মতন বিহ্বলতায় আমি স্তব্ধ হয়ে থাকলাম।

মোহনা বলল, "বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে কথাটা বলে সে চলে গেল। মা ছিল সামনে, শুনল। মাকে শোনানোর জন্যেই বলা। অথচ কথাটা মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে। বিশ্বাস কর ফুলদা, আমি তোর গা ছুঁয়ে বলছি, ওর একবর্ণও সত্যি নয়। ও আমায় ভীষণভাবে জব্দ করার জন্যে, মার কাছে আমার মুখখানা একেবারে হেঁট করে দেবার জন্যে কথাটা বলেছিল। খেপে গিয়ে আমায়, আমার ওপর আক্রোশ নিয়ে। বুঝলাম, ও কেন এত শাসাচ্ছিল। একেবারে শয়তান একটা। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। মা ধোঁকা খেয়ে গেছে, বিশ্বাসও করে ফেলেছে প্রায়। আমি যত বলি না না, মা ততই পাগল হয়ে যেতে লাগল। আমায়

কিসের বিশ্বাস! আমার আবার সম্ভ্রম কোথায়! মা, দিদি, ভাইয়ের কাছে আমার মাথা কোনোদিনই উঁচু হয়ে ছিল না। ওরা জানত, আমার সম্ভ্রম বলে কিছু নেই। তবু যা হয়ে গেল তার ধাক্কাটা ভীষণ। মা অনায়াসেই ধোঁকা খেয়ে আমায় কী না করল। সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল সেদিন, রাত্রে আরও সব নোংরা, কদর্য, কুচ্ছিত কাণ্ড হল। শেষে মা বলল, 'আমি জানতাম এইরকমই হবে, তোর কপালে ঠিক এইটেই লেখা ছিল, তুই জাতধর্ম রাখবি না, বংশের নাম ডোবাবি, তুই নষ্ট হবি, নষ্ট মেয়েছেলে হয়ে ঘর ছাড়বি, তারপর মরবি।' এই বলে মা নিজে ঘরের আলমারি থেকে আমার ঠিকুজি কোষ্ঠিটা বের করে এনে মুখের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।"

কথা বলার কোনো অর্থ হয় না, অপলক হয়ে নীরবে বসে থাকলাম।

মোহনা অল্প সময় চুপ করে থাকল, বড় বড় শ্বাস নিল, গলা পরিষ্কার কবল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "মানুষের কখন যে কি হয় বলা যায় না। মা আমার ঠিকুজি-করা কাগজটা ফেলে দিয়ে যাবার পর আমি ওটা ছুঁয়েও দেখলাম না। কেন যে মা ওটা বের করতে গেল তাও জানি না। হয়ত মা আগাগোড়া আমায় দেখে দেখে আমার ভবিতব্য বিশ্বাস করে নিয়েছিল। দেখল, সেটা মিলে যাচ্ছে। আমি প্রথমে ওই হলদে রঙের গোল করে পাকানো কাগজটা ছুঁই নি। ওটা আমার অদেখা নয়, ছেলেবেলা থেকেই দেখছি, বাবা করিয়ে রেখেছিল, বাবার এ-সবে বিশ্বাস ছিল। হিন্দুর বাড়িতে, বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে ওটা আর কজন না তৈরী করিয়ে রাখে। আমরা কখনোসখনো কাগজটা দেখেছি, বুঝি না বুঝি, কত মজা করেছি, ঠাট্টাতামাশা করেছি, আবার এক-এক সময় যেন বিশ্বাসও করেছি।···রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না। রাগ, ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা, জ্বালা—আমি যেন পুড়ে যাচ্ছিলাম। কি মনে করে সেই হলুদ কাগজটা একবার দেখলাম। তারপর ফেলে দিলাম। ভোর

রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম, আমার ভবিতব্যের কাগজটা সাপের মতন আমার মাথার পাশে ছোবল দেবার জন্যে এগিয়ে এসেছে।...পরের দিন আর অফিস গেলাম না, সকাল থেকেই বাড়ি থমথম করছে, মা একদিকে, জ্যোতি একদিকে, আমি অন্যদিকে। কেউ কারুর ছায়া মাড়াচ্ছি না। কাল যে বাদলা শুরু হয়েছিল আজ সেটা ঘন হয়ে এসেছে, পুজোর মুখ, এই এক পশলা জল নামল তোড়ে, তারপর আবার একটু নরম হয়ে গেল, কিন্তু থামল না। বাড়ির মধ্যে দমবন্ধের ভাব, সাড়াশব্দ নেই, যে যার ঘরে বসে নিজেকে একেবারে আড়াল করে রেখেছি। জ্যোতি কখন অফিস চলে গিয়েছিল; আমার স্নান হল না, ইচ্ছে হল না স্নানে, খেতেও রুচি হল না। দুপুরের দিকে কলঘরে যাচ্ছিলাম, মনে হল—নিজের ঘরে বসে মা কাঁদছে। আমার ভাল লাগল না। ঘরে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম। মার মতন বোকা আহাম্মুক আর দেখি নি। আমি বলছি, না—না; তবু মার বিশ্বাস হচ্ছে না? মা কি সত্যি সত্যিই ওই হলদে গোল করে পাকানো কাগজটাই বিশ্বাস করবে?...তারপরই আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, সাপের মতনই না কাগজটা আমার মাথার পাশে ছোবল মারার জন্যে বসে ছিল। কি আছে ওতে? কিসের ভাগ্য? কিরকম যে ঘেন্না হল, সেই পাকানো কাগজটা টেনে নিয়ে আবার দেখলাম। এই আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নাকি? কিম্ভূত ছক, এখানে গোল, ওখানে চৌকোনো, রেখার কাটাকুটি, কুচকুচে কালির অঙ্ক, অজস্র কথা লেখা, কি বা তার অর্থ কে জানে! দেখলাম খানিক, কিছু বা বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না। ফেলে দিলাম।...আমার কাছে সবটাই বাজে, বিচ্ছিরী মনে হচ্ছিল। এইভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে। সন্ধ্যেবেলায় বৃষ্টিটা উদাম হয়ে এল। কী জোরে যে জল এল, কি বলব!...দেখ ফুলদা, ওইরকম ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে চুপচাপ অসাড় ঘরে বসে থাকতে

থাকতে আমার কি যে হল কে জানে, আমি সেই দেড় দু' হাত লম্বা গোল করে গোটানো কাগজটা আলোর মধ্যে মেলে ধরে আবার দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আমার কেমন নেশা হয়ে গেল, আক্রোশ হল, হাসি পেল! এই নাকি আমার কপাল? কবেকার পুরোনো, বিবর্ণ একটা কাগজ, মাথামুণ্ডু নেই, যত হাবিজাবি লেখা—এর আবার সত্যি মিথ্যে কি! শেষে আমার ঘেন্না ধরল, একটা কাঁচি এনে কাটতে শুরু করলাম। আমার জীবনের যেটা গোড়া—কাঁচি দিয়ে সেটুকু কুচ করে কেটে ফেললাম। তারপর দেখি বালিকা অবস্থাটা, কোন একটা গ্রহ তাকে বছর দশ টেনে নিয়ে গেছে, সেটাও কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললাম। তখন আমি কিশোরী রে, ফুলদা! দেখে দেখে সেটাও কাটলাম। আমি এবার যুবতী হয়ে চলেছি, মাথার ওপর একটা গ্রহ .বসে। সেটাও কখন কাঁচি দিয়ে কেটে উড়িয়ে দিলাম। গুটোনো কাগজটা অনেকখানি ছোট হয়ে গেল। কাটা টুকরোগুলো আমার মুখের সামনে বিছানায় ছিটোনো। একে একে সবটুকু কেটে কাগজের টুকরোগুলো মার মুখের সামনে গিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসব, বলব: এই নাও—উনুনে দিয়ে এস। ...তারপরও কাঁচি দিয়ে কাটতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কি যেন একটা লেখা। মানেটানে আমি বুঝলাম না। কিন্তু কোথা থেকে একটা ভয় যেন লাফিয়ে আমার বুকে এসে পড়ল। এ কেমন ভয়, কিসের ভয়, তোকে আমি বোঝাতে পারব না। মনে হল, এরপর আর আমার কিছু নেই, আমার জন্যে আর কিছু বাকি থাকল না, সব ফাঁকা শূন্য হয়ে গেল। যেন এরপরই আমার মারক।...কী রকম যে হয়ে গেল, ভয় আমার গলা টিপে ধরল। আমার আর সাধ্য হল না কাঁচি দিয়ে কাগজটা কেটে উড়িয়ে দি। ভয়ে ভয়ে ওটা সরিয়ে রেখে দিলাম।" মোহনা থামল সামান্য, কোলের ওপর কম্বলটা আরও ঘন করে টানল, যেন সেই ভয় এসে তাকে আবার কাঁপাতে শুরু করেছে।

"কাগজটা সরিয়ে রেখে দিলাম অবশ্য—" মোহনা বলল, "কিন্তু ওই চিন্তা আর আমার গেল না। আমায় ওটা পেয়ে বসল, ভয় করল ভূতের মতন। রাত যত বাড়ে ততই যেন গ্রাস করে বসছে। আবার সেই কাগজটা ভয়ে ভয়ে বের করে নিয়ে দেখলাম। ইস—কাগজটা কত ছোট হয়ে গেছে। কতটাই না ছেঁটে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি। ছাঁটাকাটা, ছোট-হয়ে আসা কাগজটা দেখতে দেখতে একেবারেই আচমকা অদ্ভুত এক চিন্তা এল। মনে হল, সর্বনাশ, এ আমি কি করেছি! কে যেন আমার মনের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, কি করেছিস দেখ। ···ফুলদা, বিশ্বাস কর, আমার গা ছমছম করে উঠল, চক্ষু আমার এমন জিনিস দেখল যা আগে কখনও দেখেনি। মনে হল, জন্মকাল থেকেই কেউ আমার হাতে এই সম্পদ তুলে দিয়েছিল, বলেছিল—'এর কাছ থেকে যা চাইবি পাবি। যা তোর কামনা চাইতে পারিস, কিন্তু যত দেবে ততই ওটা ছোট হয়ে আসবে, দিতে দিতে ক্ষয়ে যাবে। কথাটা মনে রেখো।' ফুলদা, আমার বুক, সমস্ত সত্তা কেঁপে উঠল, ভয়ে আমাব বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, গলা দিয়ে আর শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বইছিল না। আগে কখনও আমার মনে হয়নি, আহা রে—সব যে ফুরিয়ে এল, ক্ষয়ে এল। এবার? এবার আমি কি করব? কার কাছে চাইব? আমার সম্পদের আর কতটুকুই বা থাকল?"

মোহনার গলার কাছটায় ফুলে উঠেছিল, ঠোঁট কাঁপছিল, নাকের ডগা মোটা হয়ে গিয়েছিল। ওর চোখের তারার সব জ্যোতি নিবে এসেছিল।

মোহনা ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার থেকে তার সেই আড়াল করে রাখা জিনিসটা তুলে নিয়ে আলোয় ধরল। আমি বুঝতে পারলাম, ওটা মোহনার সেই ছোট করে ফেলা কাগজ। বিবর্ণ রঙ, ময়লা জমে জমে বুঝি খয়েরী মতন হয়েছে।

মোহনা এবার বলল, "এই আমায় অবশিষ্ট। কিন্তু এর কাছে

বড় করে চাওয়ার আর আমার উপায় নেই, আজ বুঝতে পারি। অথচ আমি এতদিন আমার সম্পদ খোলামকুচির মতন ছড়িয়েছি। কোনো গা করিনি। এখন মনে হচ্ছে, হায় হায়, আমার হাতের ধন এ জীবন, কত কমে এল, এখন আমি কি করি! শোন ফুলদা, আমার যেটুকু আছে সেটুকু আমি বোকার মতন ফুরিয়ে দিতে চাই না। বল তো, আমি কি চাই এখন? এই আমার শেষ চাওয়া, তারপর ও ফুরিয়ে যাবে। বল আমি কি চাইব?"

মোহনার জীবনের প্রার্থনা এখন কি হতে পারে আমি দ্রুত ভাববার চেষ্টা করছিলাম। কিছু মনে পড়ছিল না। বিশ্রী এক ধাঁধার মতন আমার কাছে কয়েকটি প্রার্থনা আলোর রেখার মতন ফুটে উঠেছিল, নিবছিল, আবার ফুটে উঠছিল। মোহনা কি প্রেম চাইবে? মোহনা কি সত্যিই কোনো সঙ্গী প্রার্থনা করবে? মোহনা কি সুখ শান্তি কামনা করবে? কি যে চাইতে পারে মোহনা আমি স্থির করতে পারছিলাম না। এই শেষ সময়ে মোহনা আমায় বিপদে ফেলেছে।

আমার কিছু মনে এল না। মোহনার নির্বাক, স্তব্ধ, করুণ অথচ বিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল, জীবনের কোনো গোপন নিভৃত স্থান থেকে মোহনা আচমকা এক প্রার্থনার বোধ পেয়েছে। সে ছোট কিছু চায় না, আপাত কিছু চায় না। তার প্রার্থনা হয়তো এত বেশি যে তার অবশিষ্ট নামমাত্র সম্পদে সে অভাব পূর্ণ হবার নয়।

মোহনা আবার বলল, "বল ফুলদা, এখন আমি কি চাই?"

মাথা নেড়ে নেড়ে বললাম, "জানি না।"

মোহনা আর কিছু বলল না, আমার চোখে চোখ রেখে নিঃস্বের মতন বসে থাকল।

সে

আজকাল আমি অনেক কিছুই আর অবিশ্বাস করতে পারি না। ছেলেবেলায় আমার বিশ্বাসের অভাব ছিল না; ঠাকুর-দেবতা, মা-বাবার পায়ের ধুলো, মাথার ওপর আকাশে স্বর্গ, পেল্লায় চেহারার যমরাজ—এ সবই বিশ্বাস করতাম। মাঝ রাতে ডোম-পাড়ায় নিশি ডাকে, বিসর্জনের দিন মা দুর্গা কাঁদে—এইরকম আরও কত কী বিশ্বাস করেছি। ছেলেবেলাটা বোধ হয় ওই রকমই, সব কিছুই সহজে বিশ্বাস করা যায়। যৌবনে এসে দেখলাম, বিশ্বাস বলে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, অবিশ্বাসটাই বড়। আবার এখন, যখন পঞ্চাশ ছাড়িয়ে খানিকটা চলে এসেছি, তখন যেন এতটা বয়সের দেখাশোনা থেকে কেমন এক অদ্ভুত দ্বিধা এসেছে: সংসারে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা অবিশ্বাস্য তা ঠিক করতে পারছি না। কোনো কোনো জিনিস এখন আমার কাছে ভীষণ রহস্যময় মনে হয়। যেমন আজ সকাল থেকেই হচ্ছে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর, চোখের পাতা খোলবার আগেই আমার মনে হল, আমি কী হাসপাতালে? মনে হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোথাও যেন একটু আশা জাগল: যাক্, তা হলে এখনও বেঁচে আছি, মরি নি। এর পর, কী আশ্চর্য, আমার শরীর থেকে কতটা রক্তপাত হয়েছে, বিছানায় ঠিক কতটা রক্ত শুকিয়ে গিয়েছে—ভাবতে ভাবতে চোখ খুললাম। আমার ঘর, আমারই বিছানা। তবু, লেপের তলা থেকে খুব সাবধানে যেন ক্ষত-বিক্ষত ডান হাতটা বের করছি—হাতটা বের করে নিলাম। আমার চোখে ঘুমের রেশ, বা মনের মধ্যে অস্বচ্ছ চেতনা তখন আর থাকার কথা নয়। ছিলও না। তা সত্ত্বেও আমার ডান হাতটা চোখের কাছে রেখে প্রথমে হাতের তালু, পরে

উলটো পিঠ ভাল করে লক্ষ করলাম। কোথাও কোনো কাটাকুটি, আঘাত, আঁচড় দেখতে পেলাম না। একবার আমার এমনও মনে হল, হাতের তালুতে অন্তত রক্ত জমে যাবার মতন নীল দাগ কিছু থাকা উচিত ছিল। অথচ তেমন কিছু নেই; রোজ যেমন দেখি—আমার গোটা হাতটা অবিকল সেই রকম রয়েছে। এর পর আমি অনেক সহজে আমার বাঁ হাত বের করে নজর করে দেখলাম। একেবারে পরিষ্কার হাত; সারা রাত লেপের তলায় থাকার দরুন দুটি হাতই বেশ গরম।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিতান্ত যেন অভ্যাসবশে পা নেড়ে, মুখের ওপর হাত বুলিয়ে, আমার সর্বাঙ্গ অক্ষত—এটা অনুভব করে উঠে বসলাম। অথচ, আমার মনে হচ্ছিল, যে-অবস্থায় আমি ঘুম থেকে উঠে বসলাম—এই অবস্থায় আমার উঠে বসার কথা নয়। কেননা, কাল একটা ঘটনা ঘটে যাবার কথা। তা হলে কী সেটা ঘটে নি?

বাথরুম থেকে আমি ফিরে এলে ইন্দু চা নিয়ে এল। ইন্দু আমার স্ত্রী।

চা ঢেলে দিতে দিতে ইন্দু বলল, "আজ সকাল থেকেই খুব হাওয়া দিয়েছে।"

ইন্দুর মাথায় আলগা কাপড়, তার সাবেকী কালো রঙের শালটায় মাথা, গা-বুক জড়ানো। চায়ের কাপ এগিয়ে দেবার পর ইন্দু তার হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপালের কাছে কয়েকটা অগোছালো চুল সরালো। সিঁথির কাছে বাসী সিঁদুর বেশ ফিকে দেখাচ্ছিল, যেন খুব তাড়াতাড়ি সাদা হয়ে আসছে।

"মিনু ভবানীপুর যাচ্ছে", ইন্দু বলল।

"ভবানীপুর!"

"বকুলের বাড়ি থেকে সব দলবেঁধে কোথায় বেড়াতে যাবে—স্টীমারে।"

বকুল ইন্দুর মামাতো বোন। মিনু আজকাল প্রায়ই মাসীর

বাড়ি বেড়াতে যায়। বকুলের ওপর এতটা টান মিনুর থাকার কথা নয়। ব্যাপারটা অন্য রকম, মেয়ে খোলাখুলি করে না বললেও আমরা তা বুঝতে পারি।

আচমকা আমার কিছু যেন মনে পড়ে গেল। "আচ্ছা ওই ছেলেটির কী যেন নাম ?"

"বকুলদের বাড়ির ? রঞ্জন।"

"আরে না না, বকুলদের বাড়ির নয়, আশাদের বাড়ির কথা বলছি। সত্যর বন্ধু।"

"সত্যর অনেক বন্ধু। তুমি কার কথা বলছ ?"

আমি কার কথা বলছি আমার ভাল মনে পড়ছিল না। তার নাম আমার মনে আসছে না। চেহারাটাও একেবারে ঝাপসা।

"সেদিন আশাদের বিয়ে-বাড়িতে দেখেছ বোধ হয়—" অন্যমনস্ক-ভাবে বললাম, "ছেলেটি তাই তো বলল। সত্যর বন্ধু। বড় বড় জুলফিটুলফি আছে।"

ইন্দু আমার মুখের দিকে সামান্য তাকিয়ে থেকে হালকা গলায় বলল, "আজকাল সব ছেলেরই জুলফি থাকে, তোমার নিজেরটিরও। কার কথা বলছ কী করে বুঝব! তোমার ভাগ্নের বন্ধু যখন ভাগ্নেকেই জিজ্ঞেস কর। তা হঠাৎ..."

"না, এমনি—; কিছু নয় তেমন।" ইন্দুর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেবার সময় আমার কেমন অস্বস্তি হল।

ইন্দু আর দাঁড়াল না। সকালে তার নানান কাজ, ব্যস্ততা বেশি। মেয়ে ভবানীপুর যাচ্ছে, ছেলে সম্ভবত ময়দানে যাবে, ছোটটা ছাদে কুকুর নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে বোধ হয়। ঠাকুর, চাকর, ঝি—সংসার এখন ইন্দুকে বসতে দাঁড়াতে অবসর দেবে না।

চা খাবার সময় আমার কয়েকবার হাই উঠল। ঠাণ্ডায় কি না জানি না মাথার মধ্যে সামান্য ভার হয়ে আছে। চোখ কখনো কখনো ছলছল করে উঠছিল। সর্দিটর্দি হতে পারে।

বাতাসের মতিগতি সত্যি আজ ভাল নয়; পৌষ মাস, সকাল থেকেই উত্তরের বাতাস হা-হা করে ছুটে বেড়াচ্ছে। ঠাণ্ডায় কি-না জানি না আমার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, যেন জড়তা আমায় হাত পা নাড়তে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বাভাবিকভাবে অনুভব করতে দিচ্ছিল না। কিছু একটা—সেটা কী আমি জানি না, আমাকে কেমন বিমনস্ক করে রেখেছিল। অনেক সময় জ্বর-জ্বালা হবার মুখে এই রকম হয়; কিংবা শরীর থেকে গুরুতর ক্ষয় শুরু হলে এই রকম লাগে। হতে পারে, আমার মধ্যে কোনো রকমের অসুস্থতা ছড়িয়ে পড়ছে। আমার ভাল লাগছিল না।

ততক্ষণে মুখের সামনে অনেকটা রোদ এসে গেছে আমার। এই জায়গাটুকুতে আমি সকাল-সন্ধ্যে বসি, সকালের দিকটাতেই বেশি: চা খাওয়া, কাগজ পড়া, দাড়ি কামানো সব এখানে বসে বসেই সেরে ফেলা যায়। আমার শোবার ঘরের গায়ে এই জায়গাটুকু, ঠিক যে ঘর তা নয়, ঘরের মতনই। এধারের টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে ইঁটের পাতলা দেওয়াল তুলে, খড়খড়ি আর কাচ দিয়ে অনেককাল আগে এটা করা হয়েছিল। এক সময় সংসারের নানা কাজে ব্যবহার হত, আজকাল আমার বিশ্রাম, বসাটসার জায়গা। আসবাবপত্র এখানে খুবই কম: একটা ছোট মতন গোল টেবিল, পাথর বসানো; গোটা দুয়েক সাবেকী চেয়ার। ইন্দু অবশ্য এরই মধ্যে তার বিয়ের আমলের একটা সরু দেরাজ ঢুকিয়ে রেখেছে।

চা শেষ করার পর হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে রাঙতা সরাবার সময় আচমকা আমার মনে পড়ল, কাল ঠিক সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেবার পর ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি যখন নীচু হয়ে, পিঠ নুইয়ে বসার ঘরের সেণ্টার টেবিল থেকে প্যাকেটটা তুলে নিচ্ছিলাম তখন বুঝতেই পারি নি তার পর মুহূর্তেই সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই ঘাড় পিঠ নুইয়ে টেবিল থেকে প্যাকেটটা তুলে নেবার পর, আমি পিঠ সোজা

করতেই দেখলাম, আমার মুখের সামনে তখনও সে দাঁড়িয়ে। কিন্তু একেবারে অন্যভাবে। নিজের চোখকে আমার বিশ্বাস হয় নি। অথচ বিশ্বাস না করার মতন কিছু ছিল না।

পলকের জন্যে দৃশ্যটা এখন আমার মনের ওপর দিয়ে টপকে গেল। অবিকল সেই রকমভাবে, সিনেমায় যেমন দেখেছিলাম একবার, একটা মস্ত ঘোড়া অন্ধকার থেকে এসে বিরাট লাফ দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, তার সামনের দুটো পা আমাদের মাথার দিকে লাফ মেরে উঠল, তারপর তার গলা এবং বুকের তলার অন্ধকার আমাদের ভীত করে কোথায় যেন মিশে গেল।

এমন আচমকা, এত দ্রুত কালকের দৃশ্যটি আমার মনের ওপর দিয়ে লাফ মেরে চলে গেল যে, আমি ছেলেটিকে নজর করতে পারলাম না। সত্যর সে কেমন বন্ধু, কী নাম, তার মুখের চেহারাটি কেমন—এ সব যেন মনে করে নেওয়া খুবই জরুরী ছিল আমার পক্ষে। অথচ কিছুই মনে করা গেল না।

অন্যমনস্কভাবে, যেন সেই ছেলেটিকে—সত্যর বন্ধুকে—প্রাণপণে খুঁজছি, সিগারেটের প্যাকেটটা লক্ষ করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হল, আজ সকালে আমার সিগারেট আসে নি; কাল এই প্যাকেটটা সন্ধ্যে থেকে আমার হাতে রয়েছে। তাহলে, কাল এই প্যাকেটটাই হাতে থাকার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল।

সচরাচর ব্যবহার করা প্যাকেট যেমন হয় সেই রকম মামুলীই মনে হল প্যাকেটটা; চমকে ওঠার মতন কিছু নেই। এক ফোঁটা রক্তের দাগও কোথাও লাগেনি। অথচ এরকম হতে পারে না। খুবই আশ্চর্য।

ধীরে ধীরে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। শীত চনচন করে উঠেছে। মিনু এইমাত্র চলে গেল। ছেলে চেঁচামেচি করতে করতে

নীচে নেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ, তার স্কুটার খারাপ হয়ে গিয়েছে। ছোটটা নিশ্চয় এতক্ষণে দলবল সমেত পার্কে চলে গেছে ক্রিকেট খেলতে। বাড়িটা অনেকখানি চুপচাপ। কোথাও একটা প্লেন কিছুক্ষণ যাবৎ পাক খাচ্ছে আকাশের তলায়, তার শব্দ কাছে দূরে, দূরে কাছে গোল হয়ে ঘুরছে যেন। রাস্তার একঘেয়ে হল্লা আর তেমন আলাদা করে কানে পড়ে না।

টেবিলে সব কিছু সাজানো, দাড়ি কামাবার যাবতীয় উপকরণ : আয়না, সাবান, গরম জল, ব্রাশ, লোশান, খুর। আমি অনেকদিন থেকে সাবেকী হাতলঅলা খুরে দাড়ি কামাই। নিজের হাতে। মানুষের নানা রকম শখ কিংবা ছোটখাটো বিলাসিতা থাকে। দাড়ি কামানোয় আমার সেই ধরনের বিলাসিতা বরাবর। সব রকম উপকরণ সাজিয়ে, আস্তে আস্তে, আয়েশ করে, নিজের হাতে লম্বা খুর দিয়ে দাড়ি কামাতে আমার ভাল লাগে। দাড়ি কামাবার সময় একটু আধটু থেমে সিগারেট খাওয়া, সকালের কাগজের ওপর আবার এক আধবার চোখ বোলানো, অকারণে সামনে তাকিয়ে থাকা, কিংবা আয়নায় নিজের মুখ দেখায় আমার খুব আরাম। মানুষ বেশির ভাগ সময় নিজের মুখ দেখে না, দেখতে পায় না। আয়নার সামনে মুখ রাখলে নিজেকে দেখতে পায়। তখন একই মানুষ মুখোমুখি বসে যেন পরস্পরকে দেখছে এইভাবে মনে মনে কথা বলতে পারে, হাসতে পারে, তার ক'টা চুল সাদা হল, চোখের তলায় কোন ভাঁজটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, দাঁত কি বলছে—এ-সবই দেখাতে পারে।

দাড়ি কামাবার আগে সকালের শেষ চা আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন গালে সাবান মাখাও শেষ। শেভ ক্রীমে ভাল ফেনা হয়েছে। টাটকা প্যাকেটের সিগারেট খানিকটা খেয়ে ছাইদানে রেখে খুরটা তুলে নিয়েছিলাম। হাতলওলা স্ট্র্যাপে খুরের আগাটা বার কয়েক শান দিয়ে নিয়ে আমি ডান গালে খুর তুললাম।

আর সামান্য পরেই সেই সাংঘাতিক মুহূর্তটি এল, যে-মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যেতে পারত।

কী যে হল, আমি বুঝতে পারলাম না। ডান গালে আমার খুর-সমেত হাতটা হঠাৎ থেমে গেল। সমস্ত হাত অবশ, আড়ষ্ট, অনুভূতিহীন। আমার সাধ্য নেই হাত সরিয়ে নিই বা একটু নাড়া-চাড়া করি; আঙুলগুলো কোনো রকমে খুরের হাতলটা ধরে আছে, ধারালো খুরের আগা আমার গালে, কানের পাশে। সেই মুহূর্ত অবর্ণনীয়। আর তখনই অদ্ভুত এক ব্যথা বুকের ভেতর থেকে তীরের ফলার মতন বেরিয়ে কাঁধ বুক বেড় দিয়ে হাত বেয়ে একেবারে আঙুলের ডগা পর্যন্ত ছুটে গেল। ব্যথাটা আমায় অস্ফুট শব্দ করতেও দিল না, আমাকে অসাড়, অথর্ব, পঙ্গু করে দিল যেন। পলকের জন্যে আমার বোধ হয় মনে হয়েছিল, এই আমার শেষ, আমার হাতে অত্যন্ত ধারালো খুর, আমার আঙুলে সাড় নেই; এখন এই মুহূর্তে সবকিছু ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য রকম হয়ে গেল। সেই ব্যথার জন্যে হোক, অথবা ভয়ের কোনো অদ্ভুত নাড়া খেয়েই হোক, আমার হাত আবার শক্তি ফিরে পেল; যেন আচমকা তড়িৎ-হীন হয়ে যে বাতি নিবে গিয়েছিল, আবার আশ্চর্যভাবে তা দপ্ করে জ্বলে উঠল। হয়ত ব্যথার বোধই আমার অসাড় আঙুলে আবার সাড় এনে দিয়েছিল। কোনো রকমে, আস্তে আস্তে খুরটাকে নামিয়ে আমি টেবিলে রেখে দিলাম। এটা প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে ঘটে গেল। আঙুল থেকে ব্যথাটা তখন ফিরে আসছে।

যদিও আমার হাতে আর খুর ছিল না, তবু আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি বিহ্বল হয়ে বসেছিলাম্। ডান গালের অর্ধেকটাও কামানো হয়নি, বারো আনা গাল সাবানে সাদা হয়ে আছে, শেষ যে জায়গায় খুরের ফলাটা ছিল—সেখানে যেন এখনও খুরের চিহ্নটা থেকে গেছে। আর একটু যদি হাতটা থেমে থাকত, বা ওই

সময় অবশ, অসাড় আঙুল থেকে খুর ফসকে যেত কী হত বলা যায় না।

ব্যথাটা ততক্ষণে গুটিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে আবার বুকের তলায় আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছিল। কেন এ-রকম হল আচমকা আমি বুঝতে পারছিলাম না। সন্দেহ নেই, এই বিশ্রী অবস্থার পর আমার ভয় এবং উৎকণ্ঠা হচ্ছিল। ডান হাতটা নজর করলাম। কাঁপছে কী? না, তেমন কিছু নয়; বুড়ো আঙুলের কাছে—কব্জি বরাবর একটা শিরা বোধ হয় দপদপ করছে। সামান্য ঘাম হয়েছে হাতের তালুতে, ঠাণ্ডা লাগছিল। কপালেও হয়ত কয়েক বিন্দু ঘাম জমল।

কাছাকাছি কে যেন এসেছিল, আমি ইন্দুকে ডেকে দিতে বললাম।

আজ পর্যন্ত এ-রকম কখনও হয়নি আমার। কেন আজ হল, কিসের ব্যথা, কেনই বা এই পঙ্গুতা কে জানে!

সামান্য পরে ইন্দু এল। "আমায় ডাকছ কেন?"

মোটামুটিভাবে নিজেকে তখন সামলে নিয়েছি। তবু সরাসরি ইন্দুকে কিছু বলতে সঙ্কোচ হল।

"তোমার শিবু কী করছে?"

"দোকানে পাঠিয়েছিলাম, ফিরেছে। কেন?"

বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল, তবু বললাম, "নীচে আমাদের পাড়ায় একটা নাপিত ঘোরাঘুরি করে না?"

ইন্দু কিছু বুঝতে পারল না। "নাপিত? কেন?"

বিব্রত বোধ করছিলাম। এলোমেলো করে বললাম, "না, একবার ডেকে আনত। দাড়িটা কামিয়ে নিতাম।"

ইন্দু যে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছে আমার বুঝতে কষ্ট হল না। কিছুক্ষণ থমকে থেকে অবাক গলায় ইন্দু বলল, "নাপিত এসে তোমার দাড়ি কামিয়ে দিয়ে যাবে! কেন? কি হয়েছে?" বলতে বলতে

ইন্দু আমার সামনে মেলা দাড়ি কামাবার সাজ-সরঞ্জাম, আমার গালে শুকিয়ে আসা সাবানের ফেনা—সবই সবিস্ময়ে লক্ষ করছিল! খুবই স্বাভাবিক। আজ পাঁচ সাত বছর কিংবা তারও বেশি সে আমাকে অন্যের হাতে দাড়ি কামাতে দেখেনি। আমার এই বিশেষ বিলাসিতাটুকু যে তার স্বামীর স্বভাবের অঙ্গ সে ভালো করেই জানে। তাহলে আজ হঠাৎ এ-রকম কেন? কেন আমি রাস্তা থেকে নাপিত ধরে আনতে বলছি?

কোনো রকমে সামলে নেবার জন্যে ইতস্তত করে বললাম, "না, সে-রকম কিছু নয়। দাড়ি কামাতেই বসেছিলুম···কী রকম একটা ফিক ব্যথা লাগছে ডান হাতটায়। ভাবলাম—"

"ব্যথা?" ইন্দু আমার দিকে আরও ঝুঁকে দাঁড়াল।

"শিরাটিরায় টান ধরেছে বোধ হয়।"

"ঠাণ্ডাতেও হতে পারে। বেকায়দা কোথাও লাগিয়েছিলে?"

"না, মনে পড়ছে না।"

"তা হলে নিশ্চয় ঘুমোবার সময় বালিশের ওপর হাত তুলে মাথা দিয়ে শুয়েছ। ওই এক খারাপ অভ্যেস তোমার।" ইন্দু কথা বলতে বলতে আমার কাঁধ এবং হাতের ওপর একটু হাত বুলিয়ে দিল।

"ওই রকম কিছু হবে, তেমন মারাত্মক কিছু নয়।"

"আমি শিবুকে পাঠিয়ে নাপিত ডাকিয়ে আনছি। তুমি বাপু গালের সাবানটা মুছে নাও; শুকিয়ে চড়চড় করছে।"

ইন্দু চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ডাকলাম, "শোনো।"

কাছে এল ইন্দু।

আমার ডান হাতটা আস্তে করে তুলে ধরে বললাম, "আচ্ছা দেখো তো, কোনো দাগটাগ দেখতে পাও কি না?"

"দাগ! কিসের দাগ?"

"এমনি বলছি। কোথাও হয়ত লেগে টেগে গিয়েছে, খেয়াল করিনি। শিরাটিরাও অনেক সময় ফুলে যায়···!"

ইন্দু আমার হাতের তালু উলটে পিঠ কব্জি টব্জি দেখল ভাল করে। মাথা নেড়ে বলল, "না, কিছু দেখছি না।" বলে একটু থেমে আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার কী শরীরটা ভাল নয়?"

"ভালই; তবে আজ তেমন ভাল লাগছে না।"

"কাল তোমার ভাল ঘুম হয়নি; বার দুই উঠেছ।"

"হ্যাঁ, কালকে…"

"কদিন ধরে তোমার শরীরটাও কেমন দেখছি।"

"আমারও মনে হচ্ছে, কেমন লাগছে যেন, বুক পিঠে ব্যথা ব্যথাও মনে হয়।"

"আজ একবার অফিস থেকে ফেরার সময় তোমার বন্ধু নরেন-ডাক্তারকে দেখিয়ে এস। এখন বয়েস হচ্ছে…গাফিলতি করা উচিত নয়। সেদিনও আমি তোমায় বলেছি। বুঝলে?"

"দেখি।"

"দেখি নয়, আজ নিশ্চয় করে ডাক্তার দেখিয়ে আসবে।… আমি শিবুকে পাঠিয়ে নাপিত ডাকিয়ে দিচ্ছি।"

ইন্দু চলে গেল। গালের সাবান মুছে আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। সত্যি আমার ভাল লাগছিল না। কী রকম এব অবসাদ, মনমরা ভাব, অন্যমনস্কতা, বিষন্নতা যেন আমায় আরও শূন্য করে তুলছিল।

রোদ আরও অনেকটা এগিয়ে আমার মাথা ডিঙিয়ে গিয়েছিল বাতাসের মতিগতিতে যা-খুশি বেয়াড়া ভাব আরও বেড়েছে।

শিবু নাপিত ডেকে আনল।

অফিসে আমার কাজকর্ম প্রায় কিছুই হল না। সকালের সে

ব্যথাটা যদিও আর ফিরে আসেনি, তবু সব সময় আমার ভয় হচ্ছিল আবার যে কোনো সময়ে ওটা দেখা দিতে পারে, আর যদি দেখা দেয় হয়ত এবার আমি সঠিক করে সেটা চিনে নিতে পারব। ব্যথাটা কিসের, কোথা থেকে আসছে, কিভাবে ছড়াচ্ছে—এটা আমার ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। নরেনকে অফিস থেকে ফোন করেছি, ছ'টা নাগাদ সে ধর্মতলার চেম্বারে থাকবে, তাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব। আমার ডান হাত অবশ্য এখন আর দুর্বল, অবশ লাগছিল না। তবু আমি অনুভব করতে পারছিলাম, বেশ স্বাভাবিকভাবে আমি হাতটা নাড়া-চাড়া করতে ভয় পাচ্ছি। ফলে হয়ত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে খানিকটা। বাঁ হাতের ব্যাপারেও আমি লক্ষ করলাম, আমার হাতটা মুঠো হয়ে থাকছে বার বার, ফলে তালু ভিজে যাচ্ছে; রুমাল দিয়ে বেশ কয়েকবারই হাত মুছতে হল। দুপুরে চায়ের সময় পারচেজ অফিসার দত্তগুপ্ত এল। দত্তগুপ্তর বয়েস এখনও চল্লিশে পৌঁছোয় নি, খুব চটপটে, ফিটফাট ছোকরা। আমাদের অফিসে বছর পাঁচেকের মধ্যে অনেক উন্নতি করে ফেলেছে।

"স্যার—" দত্তগুপ্ত টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি চলে যাব ভাবছি।"

"এখনই?"

"না, আর একটু পরে। আমাদের ওদিকে খুব গোলমাল চলছে কাল বিকেল থেকে। দুটো মারা গেছে; আর একটা যায় যায় করছে। কাগজে দেখেছেন বোধহয় আজ।"

"ও!...না, আজ ভাল করে কাগজ দেখা হয়নি।"

"আমাদের ওদিকে কারফুর পসিবিলিটি রয়েছে আজ। সকাল থেকে বন্‌ধ্‌ চলছে।"

"কারা মারা গেল?"

"একজন শুনছি বেশ বুড়ো, ষাটটাট হবে; রাবার ফ্যাক্টরির ম্যানেজার। এক কোপেই সাবাড় করে দিয়েছে, কসাইয়ের

দোকান থেকে চপার এনে মেরেছে শুনলাম। হরিবল্। অন্যটা গিয়েছে ডিরেক্ট বোমার হিটে। বুকের ওপর হিট হয়েছিল। এ বোধ হয় পলিটিকস করত···বেশি বয়স নয়। একজন এ এস আই হাসপাতালে পড়ে আছে, বোমা খেয়েছে।"

আমি কোনো কথা বলছিলাম না; এমন কি দত্তগুপ্তর দিকে আর তাকাচ্ছিলাম না।

আরও দু-একটা কথা বলে দত্তগুপ্ত একটা খাম আমার টেবিলে—প্রায় আমার হাতের কাছে রেখে চলে গেল।

কিছুই ভাল লাগছিল না; কিছু না—কিছুই নয়। বাঁ হাতের মুঠো আর একবার রুমালে মুছে নিলাম। কপালটা ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে। প্রেসার না ঠাণ্ডা? চোখের গোলমাল বাড়ছে নাকি?

বেল টিপতেই বেয়ারা এল।

"আমায় দুটো সারিডন এনে দাও।"

পয়সা নিয়ে বেয়ারা চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি আশাকে ফোন করলাম। ওদিকে রিং হতে লাগল।

"হ্যালো!" ওপার থেকে।

"কে বিবি! আমি মামা বলছি, তোর মাকে একবার ডেকে দে।"

"দিচ্ছি। মামা, ফুলদাকে তুমি বড়দিনে পাঠিয়ে দেবে, আমরা ক্রিসমাস ট্রি সাজাচ্ছি। আজ ট্রি আনতে যাব।···মা, ওমা, মামা ডাকছে—।"

আশা এসে ফোন ধরল ওদিকে। "দাদা!"

"তোদের কী খবর?"

"এই তো। তুমি ফোন করে ভালই করলে। বাড়িতে তোমাদের কী হয়েছে? ফোন পাচ্ছি না।"

"লাইনটা গোলমাল করছে। সারাবার জন্যে তাগাদা দিয়েছি।"

"তাই বলো!...শোনো, বউদিকে বোলো—সেই জিনিসটা পাঁচ কমে পাওয়া যেতে পারে।"

"কী জিনিস?"

আশা যেন হাসল একটু। "ও তুমি বুঝবে না, মেয়েদের ব্যাপার। বউদিকে বললেই বুঝতে পারবে। তবে একটু বেশি কিনতে হবে, ভরি দশেক মতন। দেরী করলে থাকবে না। বউদি কী বলে আমায় জানিয়ো।"

"বলব। ...সত্য আছে?"

"সত্য! সত্যর তো এখন অফিস।...কোনো দরকার আছে? তাহলে অফিসে একটা ফোন করতে পার। নম্বরটা দেব?"

"থাক।...একটা কথা তোকেই জিজ্ঞেস করি। সেদিন তোর ছোট ননদের বিয়েতে একটি ছেলেকে দেখেছিলাম যেন, সত্যর বন্ধু। তার নামটা..."

"তোমার ভাগ্নের তো দেড় হাজার বন্ধু দাদা, তুমি কার কথা বলছ?"

"নামটা আমার মনে পড়ছে না।"

"কেমন দেখতে?"

"কেমন দেখতে!...মানে, আমি তো তেমন করে খুঁটিয়ে দেখি নি; জুলফি-টুলফি আছে...।"

আশা হেসে উঠল। "ছেলেগুলোর কার যে জুলফি আর কার যে দাড়ি আমি বুঝতে পারি না। সব কটাই সমান। তুমি এখন বিয়ের দিন ভিড়ে কাকে দেখেছ কি করে বলব!" বলে আশা একটু থেমে শুধলো, "তুমি নিজে দেখেছ তো? কী দরকার?"

অগত্যা আমায় চুপ করে যেতে হল, বোকার মতন।

"সত্য আসুক বলব।" আশা বলল।

"থাক। তোদের খবরটবর তাহলে ভালই। মনোরঞ্জন ভাল আছে?"

"হ্যাঁ, আমরা মোটামুটি। আজকাল যা হয়েছে। আমাদের এদিকে কী কাণ্ড হয়ে গেল পরশু! রুনুদের কলেজে অ্যাসিড ঢেলে একজনের চোখমুখ পুড়িয়ে দিয়েছে, তারপর আগুন। কী আগুন! এত ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।...যা দিনকাল একটু সাবধানে থেকো বাপু।"

ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

সুইং ডোর ঠেলে মুখার্জি এল। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, "শুনেছেন মশাই, যোশীসাহেব ছুটি নিয়ে পালাচ্ছে।"

"না, শুনিনি। কেন?"

"টেররাইজড হয়ে গিয়েছে। বলছে, আর এখানে থাকবে না—নট ইন ক্যালকাটা।" মুখার্জি তার সিগারেটের ছাই অ্যাশট্রেতে আলতো করে ফেলে দিয়ে খানিকটা যেন নিরাসক্ত গলায় বলল, "বেটাকে ভাল কথা বললে শুনত না, খালি পয়সা বাঁচাবার তাল। অনেকবার বলেছি, তোমার ওই পাড়াটা ছাড়ো, দমদমের দিকে কেউ থাকে, ওটা একটা ভিয়েৎনাম। কথা শুনবে না। কম ভাড়ায় বেশি ঘর নিয়ে থাকবে; বাসে, শেয়ারের ট্যাক্সিতে অফিস আসবে। এখন মজাটি বোঝো।"

বোঝাই যাচ্ছিল মুখার্জি চা-টা খেয়ে গল্প করতে এসেছে। লোকটা একটু বেশি রকম গল্পবাগীশ, কথাবার্তায় ঝরঝরে, মুখে তেমন কিছু আটকায় না। চেহারাটা ভালই, মাথার চুলে অ্যালবার্ট কাটে, পোশাক-আশাকে শৌখিনতা আছে।

বেয়ারা স্যারিডন নিয়ে এল।

"স্যারিডন্?" মুখার্জি জিজ্ঞেস করল।

"মাথাটা ধরেছে মনে হচ্ছে।"

"মাথার আর কী দোষ—"

"কী হয়েছে যোশীর?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা 'খতম' দেখেছে।"

"খতম দেখেছে?"

"মার্ডার। ক্লীন মার্ডার। একেবারে ওর বাড়ির কাছেই। ক'টা ছেলে মিলে আর-একটা ছেলেকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল। ছেলেটার হাতে দুধের বোতল, দুধ নিয়ে ফিরছিল। বেচারী শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়েছে, বাট নান টু হেলপ। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ।"

স্যারিডনটা খেয়ে ফেললাম।

মুখার্জি বলল, "যোশী কাঁপতে কাঁপতে অফিসে এসেছে। দেরীতে। পাড়ায় পুলিস ঢোকার পর বেরিয়েছে আর কি। চোখ মুখের চেহারা পালটে গেছে বাবাজীর। বাড়িতে বউ বাচ্চা রাখে নি, বড়বাজারে কার কাছে পাঠিয়ে তবে এসেছে। কাল পরশুই পালাবে বলছে।"

আরও একবার বাঁ হাতের ঘাম মুছতে হল। মাথাটা দপদপ করছিল।

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে মুখার্জি বলল, "যোশী ট্রান্সফার নেবার জন্যে ছটছট করছে। আমি বললুম, তুমি নর্থ ক্যালকাটা ছেড়ে আমাদের দিকে চলে এসো, অনেক পিসফুল।"

"আপনাদের দিকটা ভাল আছে এখনও।"

"অনেক। চারদিকে যা হচ্ছে মশাই তার চেয়ে ফার বেটার, দু' পাঁচটা বোমার শব্দ, পটকাফটকা তো নরম্যাল ব্যাপার। পুলিসের ভ্যান কী আর না দেখবেন—তবে বস্তিফস্তি প্রায় নেই বলে আমরা হাঙ্গামা হুজ্জুত থেকে বেঁচে গিয়েছি অনেকটা।" মুখার্জি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছল। ওর রুমালে সেন্ট মাখানো থাকে, গন্ধ এল ফিকে।

"আজকাল কোনো জায়গাই সেফ নয়, বুঝলেন পালিতসাহেব—" মুখার্জি বলল, "ইভন দিস অফিস। এই অফিসের তারকবাবুর ছেলে পুলিস কাস্টডিতে রয়েছে আপনি জানেন?"

"তারকবাবু! আমাদের বিল সেকসানের!"

"তবে আর বলছি কি!...ওই যে নতুন ড্রাইভার ছোকরা—সেটা তো শুনেছি খুব অ্যাকটিভ।" মুখার্জি তার অ্যালবার্ট-কাটা টেরিতে হালকা করে হাত বুলিয়ে নিল। "সময় যা পড়েছে পালিতসাহেব, তাতে চারপাশ দেখেশুনে চলতে না পারলে বাঁচা যাবে না! ইউ মাস্ট বি ভেরী ট্যাকট্‌ফুল, রাগটাগ কক্ষনো করবেন না। পাড়ায় চাঁদাফাঁদা চাইতে এলে পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দেবেন, নেভার আস্ক অ্যানি কোশ্চেন, টাকা নিয়ে তোরা বোমাই বানাগে যা আর পাইপগান তৈরী করগে যা। গু টু দি হেল, আমার কী! আপনি মশাই পাইপগান দেখেছেন?"

"না!"

"আমি সেদিন কাগজে দেখলাম।...আমার শালা বলছিল তাদের কলেজে প্রায় রোজই এখন পাইপগান আর বোমা নিয়ে দু' দলে ওয়ার অফ অক্যুপেশান চালায়, মানে কলেজটা দখলে আনার লড়াই। এই যুদ্ধে সেদিন একটা মেয়ের হাত গিয়েছে—বেচারী এক বিল্ডিং থেকে কলেজের আরেক বিল্ডিংয়ে যাচ্ছিল—অ্যাণ্ড ইট হ্যাপেনড।"

মিন্নুর কথা আমার মনে পড়ছিল। মিন্নুরা স্টীমারে করে কোথায় গেছে আমি জানি না; তবে আজকাল এত ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। অন্তত মেয়েদের পক্ষে। ইন্দুর এসব ব্যাপারে আরও নজর দেওয়া উচিত।

এমন সময় মিসেস বাগচী এল। মিসেস বাগচী আমাদের পুরোনো টাইপিস্ট। কোনো সময়ে দেখতে যথেষ্ট সুন্দরী ছিল, এখন বয়সটাকে নিয়ে রীতিমত উৎকণ্ঠা ভোগ করে। স্বামী নেই, মানে স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন হল; বাড়িতে একটি মেয়ে আছে।

কয়েকটা জরুরী চিঠি রেখে দিয়ে মিসেস বাগচী চলে যাচ্ছিল। মুখার্জি বলল, "আপনি পার্কসার্কাসে থাকেন না?"

মাথা নুইয়ে সামান্য নাড়ল মিসেস বাগচী।

"ওদিকের অবস্থা কেমন? খুনোখুনি হচ্ছে?"

"আমাদের দিকটায় এখনও হয়নি।"

"অ্যাংলো পাড়া বলে অনেকটা সেফ্।"

"কাল একটা বাস জ্বালিয়েছিল।"

"ওনলি ওয়ান?" মুখার্জি হাসল, "তা হলে তো খুবই ভাল পাড়া।"

কী ভেবে মিসেস বাগচী বলল, "আজ অফিস আসার সময় আমাদের আগের ট্রামের ওপর বোমা ছুঁড়েছিল।"

"কোথায়?"

"ওয়েলিংটনের একটু আগে।"

"মরেছে ফরেছে?"

"কী জানি! ট্রামটা আর দাঁড়াল না, প্রাণপণে বেরিয়ে গেল সোজা! দাঁড়ালে আগুন ধরিয়ে দিত।"

মিসেস বাগচী চলে গেল। মুখার্জি একবার ঘাড় ফিরিয়ে দরজার পাল্লাটা বন্ধ হতে দেখল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বাঁ চোখটা সামান্য ছোট করে হেসে বলল, "বুঝলেন পালিতসাহেব, বাগচীবিবি আমার অস্টিন অফ ইংল্যাণ্ডের মতন, এখনও বেশ চলছে।"

নিজের রসিকতায় নিজেই যেন মুগ্ধ হয়ে মুখার্জি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আপনাদের আর কী, গিন্নীফিন্নী নিয়ে দিব্যি আছেন। আমাদের মতন উইডোআরের অবস্থাটা বুঝতে পারবেন না। ক্লাবে তাস খেলে, আর মদ গিলে কাঁহাতক বেঁচে থাকা যায়। ছেলেটাকে বেনারসে পড়তে পাঠিয়ে আরও ফাঁকা লাগছে। সিচুয়েসান ইমপ্রুভ করলে ছেলেটাকে আনিয়ে নেব ভাবছি।"

মুখার্জি চলে গেল। আরও একটু জল খেলাম। স্যারিডনের স্বাদ যেন গলার কাছে লেগে আছে। ঘড়িতে তিনটে বাজল।

স্লিপ প্যাডে অকারণে লাল-নীল পেনসিলটা বোলাতে বোলাতে এমন একটা বিচিত্র ছবি হল যে আমার মনে হচ্ছিল, কিম্ভুত কোনো জীবকে আগুনের মধ্যে রেখে ঝলসানো হচ্ছে।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরলে ইন্দু আমার শরীর সম্পর্কে জানতে চাইল। আমার বন্ধু নরেনের কাছে গিয়েছিলাম। নরেন কিছু ধরতে পারেনি, ব্লাডপ্রেসার সামান্য বেড়েছে, ওটুকু কিছু নয়। ব্যথাটা অ্যানজিনার কী না—সে বুঝতে পারছে না, তার লক্ষণ খানিকটা আলাদা। তবে বয়স হচ্ছে, চারপাশে যেরকম অবস্থা—অশান্তি, উদ্বেগ, আপদ-বিপদ, টেনসান—তাতে হুট করে একটা কিছু হয়ে গেলেও অবাক হবার নেই রে ভাই। যাই হোক, পরে একটা ই সি জি করে নেব। আপাতত একটা টনিক খাও, টেক সাম মালটিভিটামিন ট্যাবলেটস। মনে হচ্ছে, ভেগাস্ পেইন্। টায়ার্ডনেস, ফেটিগ কেটে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

"নরেন বলল, তেমন কিছু নয়, কাজকর্মের চাপ থেকে হয়েছে। বিশ্রাম নিতে বলল।"

"তা হলে ছুটি নাও অফিস থেকে", ইন্দু বলল, "কদিন কোথাও বেড়িয়ে এসো; শীতের সময় ভালই হবে।"

"দেখা যাক্।"

আজ শীতটা বোধ হয় মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বাতাস এখন যেন আরও বেপরোয়া, সারা দিনের ধুলো জমে গিয়েছে, শূন্যে ধোঁয়া প্রায় স্থির হয়ে আছে, কুয়াশা জমছিল, জমে এমন একটা বুনন তৈরী করে ফেলেছিল যে কোনো কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না।

মিনু ফিরে এসেছে। মনে হল, তার দিন ভালই কেটেছে, গুনগুন করে গান গাইতে শুনলাম এক আধবার। আমার বড়

ছেলে তার ঘরে রেডিও খুলে খবর শুনছিল, এখন বোধ হয় বইপত্র খুলে বসল, ম্যানেজমেণ্টের শেষ পরীক্ষাটা বাকি। ছোটটা এমন শীতে লেপের তলায় ঢুকে ইন্দ্রজাল কমিকস-এর বই পড়ছে হয়ত।

শোবার ঘরে বসে বসে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। ইন্দু মাঝে মাঝে আসছিল। তার মুখে সব সময়ই সংসারের কথা: বাড়ির প্ল্যানটা অদলবদল করাতে এত দেরী হচ্ছে কেন? মিনুর যেরকম মন পড়ে গিয়েছে ওদিকে তাতে এবার তাড়াতাড়ি বকুলের সঙ্গে বসে কথা বলতে হয়। ঠাকুরঝিকে বলে রেখেছিলাম, দু'দশ টাকা কম করলে ভরি দশ পনেরো নিতে পারি, তা ও যখন খবর দিয়েছে, টাকাটা পাঠিয়ে দিতে হয়। মুশকিলটা কী জানো, খোদ স্যাকরারা পর্যন্ত চোরা সোনা কিনতে ভয় পায়, ঠকে যাবার ভয় রয়েছে; তবে ঠাকুরঝি যেমন চালাকচতুর, ওকে কে ঠকাবে!

আমার কিছুই ভাল লাগছিল না। ইন্দুর কথা আমি মন দিয়ে শুনছিলাম যে তাও নয়। মানুষের মনের মধ্যে অনেক সময় কেমন একটা ঘোলাটে ভাব হয়ে আসে, তখন সবই এত অপরিষ্কার এলোমেলো যে কিছুই ভাবা যায় না, ভাবতে ভাল লাগে না। আমি কোনো কথাতেই উৎসাহ পাচ্ছিলাম না।

ক্রমে রাত হল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর যে যার ঘরে। সংসারের শেষ কাজটুকু চুকিয়ে ইন্দুও তার ঘরে গেল। আমার শোবার ঘরের পাশে ইন্দু আর ছোট ছেলেটা শোয়, তার পাশের ঘরে মিনু। বড় ছেলে একেবারে শেষের দিকের ঘরটা নিয়েছে। সিঁড়ির এ-পাশে তার ঘর, অন্য পাশে বাইরের লোকজন এলে বসার ঘর। নীচে রান্নাবান্না, ঠাকুর-চাকরের থাকা।

বাড়িটা সাড়াশব্দহীন হল; কোথাও যে বাতি জ্বলছে তাও মনে হল না। পাড়াটাও একরকম নিস্তব্ধ, কদাচিৎ শীতের মধ্যে এক আধটা গাড়ি কিংবা রিকশার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শেষে অনেকক্ষণ তাও আর শোনা গেল না।

আমার ঘুম আসছিল না। লেপের তলায় শুয়ে শুয়ে শেষ পর্যন্ত আমি এমন একটা ক্লান্তি এবং বিরক্তি বোধ করলাম যে ছেলেমানুষের মতন পা দিয়ে লেপ সরিয়ে হাত দুটো ঠাণ্ডায় মেলে রাখলাম। সামান্য পরেই হাত-পা কনকন করে উঠল। অন্ধকারে ছুঁচ খোঁজার মতন আমি যে অন্ধ হয়ে কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছি এটা তো বোঝাই যায়। কিন্তু কী, কাকে খুঁজছি? সত্যর বন্ধুকে?

সারা দিন যাকে খুঁজে পেলাম না, এখন আর যে তাকে খুঁজে পাব এমন আশা প্রায় যখন ছেড়ে দিয়েছি, আচমকা তার নাম আমার মনে পড়ে গেল। আদিত্য। হ্যাঁ, নাম বলেছিল আদিত্য।

নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার পর পর সবই আশ্চর্যভাবে মনে পড়ে গেল।

কাল সন্ধ্যেবেলায় সে এসেছিল। অফিস থেকে ফিরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে আমি তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। চা-টা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কে যেন এসে বলল, একটি ছেলে দেখা করতে এসেছে। বাইরের বসার ঘরে আছে।

বসার ঘরে এসে দেখলাম ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। ছিপছিপে চেহারা, মাথায় সামান্য লম্বা, কোঁকড়ানো বড় বড় চুল, রুক্ষ গালে লম্বা জুলফি, দাড়িটাড়ি দু চারদিন বোধ হয় কামায় নি। আজকাল ছেলেরা যে ধরনের প্যাণ্ট পরে সেই রকম প্যাণ্ট, গায়ে পুরো হাতা কালো সোয়েটার, গলায় একটা স্কার্ফ মাফলারের মতন করে জড়ানো।

ছেলেটি তার পরিচয় দিল। "সত্য আমার বন্ধু। আমার নাম আদিত্য।"

"ও! সত্যর বন্ধু—! বসো বসো।"

আদিত্য বসল।

"তোমায় আগে দেখেছি কী!" বসতে বসতে আমি বললাম।

"বিয়ে বাড়িতে হয়ত।"

"ও! আচ্ছা!...তা কি ব্যাপার বলো?"

আদিত্য আমার দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ছেলেটিকে দেখতে আমার মন্দ লাগছিল না: নাকটি বেশ ধারালো, লম্বা, থুতনি শক্ত, চওড়া কপাল। তবু ওর চোখ মুখ তেমন স্বাভাবিক, সজীব মনে হচ্ছিল না। কেমন যেন রুগ্ন, দুর্বল। চোখ দুটি অন্তত সামান্য হলুদ, নিষ্প্রাণ, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। দেখলাম, আদিত্য তার দুটি হাতই প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। এটা আমার পছন্দ হল না; আমার ভাগ্নের বন্ধু আমার সামনে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসে থাকবে—আমার চোখে এটা অশালীন মনে হল। তবে যেরকম শীত, হয়ত তার হাত দুটো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বলেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে।

"কি ব্যাপার বলো?" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ছেলেটি সত্যর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আমার কাছে চাকরি-বাকরির খোঁজে এসেছে। এ রকম অনেকেই আসে।

আদিত্য কোন কথা বলল না, আমার দিকে তাকাবার চেষ্টা করে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

ছেলেটি লাজুক। হয়ত খানিকটা আত্ম-সম্মান বোধ করছে চাকরির উমেদারি করতে।

অগত্যা আমিই অন্যভাবে কথাটা পাড়লাম।

"তোমার বয়েস কত?"

ঘাড় ফিরিয়ে আদিত্য তাকাল। "চব্বিশ-টব্বিশ।"

"সত্যর সঙ্গে পড়তে?"

"না।"

"তা হলে ইউনিভার্সিটি..."

"যাই নি।"

আমার মনে হল, কথাটায় আদিত্য বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হল। ভদ্রতা

করে বললাম, "ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া অবশ্য এখন মীনিংলেস, কিছুই হয় না ওখানে; অযথা সময় আর পয়সা নষ্ট। বছরের মধ্যে আট দশ মাস তো বন্ধই থাকে। খুললেই গণ্ডগোল।" আদিত্যকে যেন আমি সান্ত্বনা দেবার মতন করে একটু হাসার ভাব করলাম। "প্র্যাকটিক্যালি এখন তো মনে হয় একটা পুরোনো ঠাট দাঁড়িয়ে আছে। খুবই খারাপ লাগে বুঝলে আদিত্য, আমাদের খুব দুঃখ হয়। সে একটা সময় গেছে—গোল্ডেন ডেজ। ভাল ভাল ছেলে, ব্রিলিয়ান্ট বয়েজ, স্কলারস, প্রফেসারস—কী রেপুটেসান্ ছিল। তার পর দেখতে দেখতে সব গেল। এখন হাট-বাজার; অ্যাডমিনিসট্রেসান নেই, ডিসিপ্লিন নেই, পড়াশোনার পাট তো চুকেই গেছে। এক একটা পরীক্ষা নিয়ে দেখো না কত কেলেঙ্কারী হয়, কাগজে বেরোয়। আমাদের কী ট্রাডিসন ছিল—স্যার আশুতোষ, রাধাকৃষ্ণণ, রমন, মেঘনাদ সাহা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ…। আর আজ? ছি ছি! ভাবতেই আমাদের মতন আধ-বুড়োদেরও বাস্তবিকই কষ্ট হয়।"

"আপনাদের ইউনিভার্সিটি।" আদিত্য চাপা গলায় বলল, অন্য দিকে তাকিয়ে, যেন আমায় বিদ্রূপ করতে চাইল। অথচ তার বিদ্রূপের ভঙ্গি এতই অস্পষ্ট যে আমার অসন্তুষ্ট হবার উপায় নেই।

"তুমি নিশ্চয় কলেজে পড়েছ?" ইতস্তত করে বললাম।

আদিত্য অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল।

"বি-এ না বি এস-সি?"

"বি এস-সি হলে?"

"ভালই তো! তা চাকরিবাকরি?"

ঘাড় নাড়ল আদিত্য। চাকরি করে না।

আমার অনুমান মোটামুটি তাহলে ঠিক, আদিত্য বেকার, সত্যর কাছ থেকে খবরটবর নিয়ে চাকরির জন্যে আমার কাছে এসেছে।

যারা চাকরিবাকরির জন্যে ধরনা দিতে আসে তাদের সঙ্গে অবশ্য এই ছেলেটির ব্যবহারে মিল নেই। ওর কোনো রকম কাকুতি-মিনতি, অনুনয়, হাত পাতার ভাব নেই। একটা চাকরি চাইতে এসে অন্যরা যেরকম করে, কথা বলে, দুঃখকষ্ট জানায়, ব্যাকুলতা প্রকাশ করে—আদিত্যর মধ্যে সেসব কিছুই দেখছিলাম না। বাস্তবিকপক্ষে এটাই আমার ভাল লাগছিল। কেউ এসে কাঁদাকাটা করলে প্রথমে খারাপ পরে বিরক্তি লাগে। কথাবার্তাও নিজের থেকে বলছে না ও, যেটুকু নিতান্ত না বললে নয় মাত্র সেইটুকু বলছে—তাও আমার কথার জবাবে। অথচ ছেলেটাকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না, একটু বেশি রকম অন্যমনস্ক, খানিকটা যেন অস্বস্তি রয়েছে। আমার মনে হল, আমার কাছে—এই সাজানো-গোছানো বাইরের ঘরে আদিত্য বেশ আড়ষ্ট, সঙ্কোচ, এবং খানিকটা ভয় ভয় ভাব নিয়ে বসে আছে। হয়ত এই জন্যেই কথাবার্তা বলতে পারছে না।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। ধরিয়ে প্যাকেট আর দেশলাইটা সামনের নীচু সেণ্টার টেবিলে রেখে দিলাম। এপাশের বড় সোফায় আমি, সেণ্টার টেবিলের ও-পাশে ছোট সোফায় আদিত্য, আমরা মুখোমুখি বসে।

"চাকরিবাকরির অবস্থা খুব খারাপ—" আমার গলা থেকে কথার সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া আস্তে আস্তে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এল। "আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট এখন একটা মেজর প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ন্যাশনাল প্রবলেম। কাগজে একটা ফিগার দেখছিলাম সেদিন, আই ডোণ্ট রিমেমবার এক্‌জাক্টলি, বাট ইট মাস্ট বি সাম মিলিয়ান্স। ফোর্থ প্ল্যানের আগেই সাম থ্রি পয়েণ্ট সামথিং। কত লক্ষ হল যেন? তা লাখ পঁয়ত্রিশ হবে। বাংলা দেশেই দেখো না, সাত আট লক্ষ। আমাদের ছেলেবেলায়, তিরিশ-বত্রিশ সাল নাগাদ এ রকম একবার দেখেছি—মাথা খুঁড়েও চাকরি জুটত না,

আই-এ বি-এ পাস করে ছেলেরা ফ্যাফ্যা করত। অবশ্য তখন এরকম চোখে লাগত না, আজকাল যেমন লাগে, পপুলেসান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকারের ভল্যুমটাও তো বেড়ে যাচ্ছে, না কী বল হে? তাছাড়া তখন লেখাপড়া জানা ছেলের নাম্বারটাও কম ছিল, এখন স্কুল ফাইন্যাল আর হায়ার সেকেণ্ডারীতেই তো হাজার পঞ্চাশ করে বেরুচ্ছে বছরে। সে টুকে-টুকে যেমন করেই হোক। তা তুমি স্কুলে চেষ্টা করলে না কেন? শুনেছি সাইন্স টিচারদের ডিম্যাণ্ড আছে। মাইনেপত্রও এখন ভদ্রলোকের মতন হয়েছে।"

আদিত্য ছোট্ট করে একবার কাশল। কাশল না হাসল! মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। এই যে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাকরির বাজারের কথা বললাম, তাতে ওর বোঝা উচিত ছিল, আমি বাস্তবিক তাকে হতাশ করছি। ছেলেটা বাস্তবিকই অদ্ভুত। কিংবা এমন হতে পারে, সে খুব একটা আশা নিয়ে এখানে আসে নি।

"স্কুল তোমার পছন্দ নয়?" সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আমি শুধোলাম।

আদিত্য যেন ম্লান একটু হাসল।

"তোমার পছন্দ নয়? ধরা করার লোক পাচ্ছ না?" আদিত্যর চোখে চোখে তাকাবার চেষ্টা করলাম। "স্কুলের ব্যাপার হলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি; আমার এক বন্ধু কোন্ স্কুলের যেন সেক্রেটারি। তবে, ইস্কুলটিস্কুল কী আর থাকবে হে, তোমরা তো সব তুলেই দিচ্ছ—" বলে একটু হাসলাম, পাছে আদিত্য ক্ষুণ্ণ হয় সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আমি তোমাকে মিন্ করছি না। যা দেখছি আজকাল—তাই বলছি। কী যে ব্যাপারটা হচ্ছে—আমাদের বাপু মাথায় ঢোকে না। সব পুড়িয়ে দিলেই কী ঝঞ্চাট মিটে যাবে! আমি স্বীকার করছি, মোর দ্যান্ নাইন্টি পার্সেণ্ট স্কুল একেবারে রটন, গোয়াল, কিচ্ছু হয় না। মাস্টাররা পান চিবোয়, চা খায়, পে-স্কেল করে, স্কুল থেকে বেরিয়ে হিন্দী সিনেমা দেখে,

ইভন্ কিছু মাস্টারফাস্টার আজকাল দেশী মদের দোকানেও ঢোকে। খুবই খারাপ। আরে, আমার পাশের বাড়িতে জগদীশ মাস্টার থাকে; সে আর তার বউ তুজনেই মাস্টারি করে; তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, গত বছর জগা-মাস্টার একটা স্ক্যাণ্ডাল করেছিল, কাগজে বেরিয়েছিল, সেই থেকে শুনেছি এগজামিনারশিপ গিয়েছে।" সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলাম।

আদিত্য আবার কাশল। গলার স্বরটা ভাঙা। ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।

"একটু চা খাও।"

"না না।"

"খাও। খুব ঠাণ্ডা। তুমি আমার ভাগ্নের বন্ধু—ভাগ্নেরই মতন। চা খাও একটু, আবার তো ঠাণ্ডায় যেতে হবে।"

চায়ের কথা বলতে আমি ভেতরে গেলাম। আদিত্য বসে থাকল।

ফিরে এসে দেখি আদিত্য সেই একইভাবে বসে আছে, সামান্য কাত হয়েছে এই মাত্র; তার হাত তুটো তখনও প্যান্টের পকেটের মধ্যে।

"তুমি কোথায় থাক আদিত্য?"

"তা একটু দূরে।"

"সত্যদের পাড়ায়?"

"না।"

"আমি ভেবেছিলাম সত্যদের ওদিকেই থাকো।"

"পাকা রাস্তা নেই। হেঁটে যেতে হয়।"

"হাঁটাই আজকাল ভাল: কলকাতায় ট্রাম-বাসের যা অবস্থা। প্রত্যেকদিন পাঁচ দশটা করে লোক মরছে। এ—তো লোক, এ—তো ভিড়; আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের গলা বুজে গিয়েছে। কলকাতার জন্যে কিচ্ছু হচ্ছে না। কী করেই বা হবে

বলো, আমরা কিছু হতেই দেব না; হবার চেষ্টা হলেই বানচাল করার মতলব করছি। ধর, এই স্টেট বাস—বিধানবাবু তো ভালই চেয়েছিলেন—কিন্তু অবস্থাটা দেখ, এখন স্টেট বাস আর মোষের গাড়ি সমান। হাউ ডার্টি, আগ্‌লি। ভেঙেচুরে, পুড়িয়ে, শ্লোগান লিখে লিখে কী চেহারা করেছে গাড়িগুলোর। কোনো ভদ্র শহরে এরকম দেখা যায় না। আমরা যে কী হয়ে যাচ্ছি—”

“গিয়েছি—” আদিত্য যেন বলল।

“বলতে কি, আমাদের তো মাথা গোলমাল হয়ে যায়। কিচ্ছু বুঝতে পারি না। সামথিং হ্যাজ্‌ হ্যাপেন্‌ড্‌। বাট হোয়াট? তুমি ইয়ং ম্যান। আমার ছেলে, ভাগ্নে সত্য, তুমি—তোমরা মোটামুটি সমবয়েসী। আমাদের পরের জেনারেশান। ওয়েল, টেল মী, এটা কী হচ্ছে?”

আদিত্য তার পা জড়াজড়ি করে বসে ছিল; এবার পা সরাল। তার মুখ দেখে মনে হল, সে আগের চেয়ে স্পষ্ট করে হাসল একটু।

“আমি দেখছি গ্র্যাজুয়েলি সব কিছু ডিগ্রেড করে যাচ্ছে। ডিসেন্সি নেই, অনেস্টি নেই, লেবার নেই, ধৈর্য নেই। কী যে আছে, ভগবান জানেন। আমি তোমাকে একটু আগে স্কুলকলেজের কথা বলছিলাম। নিন্দে করছিলাম। বাট স্টিল এগুলো একটা সিস্টেম, মানে এই প্রসেস আমরা স্বীকার করে নিয়েছি অনেকদিন ধরে। হাজার দোষ আছে এর, কিন্তু সত্যি বলো, এর অলটার-নেটিভ কী! শুধু পুড়িয়ে দিলেই চলবে! ক্ষেত কুপিয়ে দিলেই ফসল হয়? ডোণ্ট টেল মী টু বিলিভ ইট্‌। মানুষ পাগল হয়ে গেছে। নয়ত এ রকম হয়। সারাটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন মারামারি, খুনোখুনি, আগুন জ্বালানো, লুঠতরাজ, সকালে কাগজ ছুঁতেই ভয় হয়। রোজই দেখো মার্ডার, ডেথ, কিলিং।”

চা এসে গিয়েছিল। শিবু ট্রে থেকে দু কাপ চা নামিয়ে রাখল, একটা ডিশে কিছু স্ন্যাকস্‌।

"নাও চা খাও", আমি বললাম; বলে আমার কাপটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম।

আদিত্য সামান্য পরে তার বাঁ হাতটা বের করল।

"চার পাশ দেখে শুনে এখন তো রীতিমত বুক কাঁপে, বুঝলে—" চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, "যে কোনো দিন আমরা রাস্তায়, পার্কে, অফিসের সিঁড়িতে গড়াগড়ি যেতে পারি। কোনো সিকিউরিটি নেই লাইফের। নাইদার এজ্ নর প্রফেসান্ কোনো রকম কনসিডারেসান দেখছি না। মেয়েটেয়েদেরও বা ছাড়ছে কোথায়!"

আদিত্য বাঁ হাতে চায়ের কাপ তুলে আস্তে করে চুমুক দিল। তার হাত বেশ কাঁপছিল। কেন কাঁপছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না। ঠাণ্ডায়? ওর কী কোনো অসুখ আছে? এই ঘরে এত ঠাণ্ডা নিশ্চয় নেই যে ওর হাত কাঁপতে পারে। ছেলেটির যা বয়েস তাতে ওর হাত কাঁপার রোগ থাকারও কথা নয়। খুব সম্ভব আদিত্য খানিকটা নার্ভাস ধরনের ছেলে; তার হাবভাব আচার আচরণ থেকে সেই রকমই মনে হয়।

"ওকি, তুমি কিছু মুখে দিলে না?"

আদিত্য সামান্য মাথা নাড়ল, ও কিছু খাবে না। আমার দৃষ্টি লক্ষ করেই কী না কে জানে চায়ের কাপটা ও আর তুলছিল না। অন্যের দুর্বলতা এভাবে লক্ষ করা অনুচিত, আমারই কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

"তোমার দেশ কোথায়, আদিত্য?"

"দেশ।"

"পূর্ব বাংলায় না এদিকে?"

আদিত্য সাড়া দিল না।

"আমার আদি বাড়ি কুমিল্লা। অবশ্য ওই বাড়িই। ছেলেবেলায় এক-আধবার গিয়েছি; আমার আর মনেও নেই। এদিকেই মানুষ। বাবা নন্‌কোঅপারেশানে ছিল, মাও চরকা কাটত। তার-

পর একটা দেশী ব্যাঙ্ক নিয়ে পড়ল বাবা। উদয়-অস্ত খাটত। খাটতে খাটতেই মারা গেল। আমাদের একটা সময় বেশ খারাপ গেছে। মানুষের জীবনে ব্যাড ডেজ আসেই। তা যেমন করেই হোক সে সব তো আমরা পেরিয়ে এসেছি। বেটার টু ফরগেট দোজ স্যাড মোমেন্টস। এখন আর কী বলো, আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, দু পাঁচ বছর আর বড়জোর বাঁচতে পারি। তার আগেও যে মরছি না—কে বলতে পারে, যা দিনকাল। আরে সেদিন দেখি ক'টা বাচ্চা নীচে টিনের পিস্তল নিয়ে খেলা করতে করতে চেঁচাচ্ছে 'হেডুর মুণ্ডু চাই'; মানে হেড্ মাস্টারের মুণ্ডু। জাস্ট ইমাজিন...” বলতে বলতে আমি হেসে উঠলাম।

আদিত্য কোনো কথা বলছে না। আমার মনে হল, এবার উঠে পড়তে হয়। খানিকটা রাতও হয়েছে।

আদিত্যর দিকে তাকিয়ে সামান্য বসে থাকলাম। “আজ তা হলে—।”

আদিত্য পিঠ সোজা করল।

“তুমি তো দূরেই যাবে খানিকটা। বেশ শীত। আর একদিন বরং এসো—” বলতে বলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

আদিত্যও উঠে দাঁড়াল।

যদিও আমি বুঝেছি, তবু আদিত্য মুখ ফুটে কিছু বলে নি বলেই যেন বললাম, “তুমি কেন এসেছিলে বললে না? তুমি একটু বেশি লাজুক হে। ঠিক আছে—পরে একদিন...” বলতে বলতে আমি পিঠ নুইয়ে সেণ্টার টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই তুলে নিচ্ছিলাম। পিঠ সোজা করতেই দেখি আদিত্য আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তার ডান হাতটা আর পকেটের মধ্যে নেই।

একটি কি দুটি মুহূর্ত আমি যেন কিছুই বুঝতে পারলাম না, তার পরেই বুঝতে পারলাম, আদিত্য তার ডান হাতে একটা

লম্বাটে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল ও যেন স্প্রিং টেপার পর ছুরির ফলাটা লাফ মেরে খাপ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, অথচ অবিশ্বাসের কিছু ছিল না।

অদ্ভুত একটা আতঙ্ক, বিহ্বলতা, অবিশ্বাস আমায় পাথর করে দিল। আদিত্যও ডান হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

"তুমি···তুমি···" আমার গলা ভয়ে কাঁপছিল, হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে কণ্ঠনালীর কাছে চলে এসেছে। "তুমি কী পাগল নাকি! তোমার মাথা খারাপ! ছুরিটুরি নিয়ে আমার বাড়িতে ঢুকেছো!"

আদিত্য আমার দিকে একটা পা বাড়িয়ে দিল। ওর হাত যেন আঘাত করার আগে হঠাৎ ওপরে উঠল।

"কী সাংঘাতিক! তুমি আমার ভাগ্নের বন্ধু বলে এ বাড়িতে ঢুকে আমায় ছোরা মারতে এসেছ।" বলতে বলতে আমি পাশে সরে যাবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না. কেননা ছোরাটার দিকে আমার দৃষ্টি, চোখ সরাবার উপায় নেই।

আদিত্যর হাত কাঁপছিল, বেশ কাঁপছিল। আমার কেন যেন মনে হল, সে ঠিক মতন ছোরা ধরতে পারছে না।

"আশ্চর্য! আমি বুঝতে পারছি না তুমি এটা কী করছ!··· উন্মাদ নাকি! ইট ইজ এ ক্রাইম।···কী চাও তুমি? আমার কাছে কেন এসেছ?"

আদিত্য যেন তার কাঁপা হাতটাকে স্থির করার জন্যে দু দণ্ড সময় নিল, তারপর হাত তুলল।

কী আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে আদিত্যর চোখের দিকে আমার নজর পড়ল। ঘৃণায় দুটি চোখ জ্বলে যাচ্ছে। এমন ঘৃণা আমি আর কখনো দেখি নি। অকৃত্রিম পৈশাচিক ঘৃণা। এই ঘৃণার যেন শেষ নেই। কত কাল ধরে জমে জমে যেন পাথরের মতন কঠিন হয়ে গিয়েছে। তার ঘাড় এবং কাঁধ কী শক্ত বেয়াড়া ঘোড়ার ঔদ্ধত্যের মতন দেখাচ্ছিল। আদিত্যর ঠোঁট খুলে দাঁত বেরিয়ে এসেছে,

ভীষণ নির্মম নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। তার চোখ থেকে আমি দৃষ্টি সরিয়ে ওর হাতের ছোরার দিকে তাকালাম। ভগবান জানেন, এই রকম এক বিপজ্জনক মুহূর্তেও আমার কেন যেন মনে হল, আদিত্যর চোখ ওর হাতের ছোরার চেয়েও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর, ধারালো। ওর ঘৃণায় কোনো দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই, যেন আজন্মকাল নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতন ওটা ওর রয়েছে এবং দিন দিন বেড়ে উঠেছে। অথচ হাতের ছোরাটা হয় কিনে না-হয় কুড়িয়ে এনেছে, তেমন একটা নিশ্চিতভাবে ধরতে পারছে না।

ততক্ষণে আদিত্য আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রথম আঘাত হানল। আমি ডান হাত বাড়িয়ে বাঁচাতে গেলাম। ছোরার ফলা আমার হাতের আঙুলে লাগল। হয়ত আমি চিৎকার করে উঠে-ছিলাম। আদিত্য আবার মারল। এবারও ডান হাতের তালুতে লাগল। অসহায়ের মতন পিছু সরতে গিয়ে আমি সোফার ওপর বসে পড়লাম। আদিত্য পাগলের মতন তৃতীয়বার মারল। এবার বাঁ হাতে আটকাবার চেষ্টা করলাম। আমার হাত চিরে গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। শেষবারের মতন যখন সে মারছে তখন আমি মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম।

বোধ হয় আমি তখন আর্তনাদ করে বাড়ির লোকদের ডাক-ছিলাম। গলা উঠেছিল কি না জানি না, আদিত্য কী একটা বলল, হয়ত গালাগাল দিল: কাওয়ার্ড, বাস্টার্ড, শালা—কী বলল কে জানে, আমার দিকে আর তাকাল না, পিছন ফিরে দ্রুত চলে গেল। তার পিঠ আমি দেখতে পেলাম।

আদিত্য চলে যাবার পর দু-এক মুহূর্ত আমার কোনো চেতনা ছিল না। তারপর ওই অবস্থায় প্রায় ছুটে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। জানলার এক দিকের শার্সি খোলা ছিল।

আমি যেন দেখছিলাম আদিত্য কোথায় যায়।

ধোঁয়া, কুয়াশা, খানিক অন্ধকার, খানিকটা টিমটিমে আলোর

মধ্যে আদিত্য রাস্তা দিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে মাথা নীচু করে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। রাস্তার আবর্জনা টপকে একটা কুকুরকে ডিঙিয়ে যেতে যেতে মোড়ের মাথায় সে একটা প্রাইভেট বাসকে থামতে দেখল। বাসটায় ভিড় ছিল। ঠিক বাসটা ছেড়েছে, আদিত্য লাফ মেরে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল। তারপর ঝুলতে ঝুলতে আড়ালে চলে গেল।

ভগবান জানেন আমার তখন কী হয়েছিল, আমি কেন বার বার তাকে ডাকতে চাইছিলাম : আদিত্য, আদিত্য, আদিত্য।

সারাদিন যা আমায় অস্থির, ভীত, ব্যাকুল করে রেখেছিল এখন তা খুঁজে পাওয়া গেল। ছেলেটিকে আমার মনে পড়েছে : আদিত্য। তার চেহারাও আমার কাছে আর অস্পষ্ট নয়। অবশ্য এখন আমার মনে হচ্ছে, সে সত্যর বন্ধু নাও হতে পারে—সুবিধের জন্যে একটা পরিচয় দিয়েছিল। এমন কি তার নামও হয়ত আদিত্য নয়, ওটা মিথ্যেও হতে পারে।

ওর নাম আদিত্য না হয় না হোক, ও সত্যর বন্ধু যদি নাই হল তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কিছু তাতে আসে যায় না। কিন্তু ও যে সত্যি—এ আমি অনুভব করতে পারছি। আশাদের বিয়ে-বাড়িতে গিয়ে সত্যর ওই ধরনের কোনো মুখ হয়ত দেখেছি, হয়ত নয়। তাতেও কি যায় আসে।

খুবই আশ্চর্য যে, আদিত্য আমায় আহত করে চলে যাবার পর আমি জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখবার এবং ডাকবার চেষ্টা করছিলাম। কেন? আমি কি তাকে ডেকে বা তার নাম ধরে চেঁচিয়ে পাড়া জাগাবার চেষ্টা করছিলাম? তাকে ধরে ফেলে পুলিসের

হাতে দেবার চেষ্টা করছিলাম? আমার মনে হল না, আমি সে চেষ্টা করছি। আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না।

তা হলে? তা হলে কেন আমি ডাকছিলাম আদিত্যকে?

কেন? কেন? আজ সারা দিন যেন এই কেনর জন্যে আমি মাথা খুঁড়েছি। সারাদিন আদিত্যকে মনে মনে কত খুঁজেছি।

উলকি পরাবার একটা সরু তীক্ষ্ণ ছুঁচ যেন আমার মাথার মধ্যে, শেষে অস্তিত্বের মধ্যে বার বার—বার বার ফুটতে লাগল: কেন? কেন? কেন?

অন্ধকারের কোথাও একটু আলোড়ন আসছিল না। কোথাও কিছু দপ্ করে ফুটে উঠছিল না। হায় ভগবান!

শেষে খুবই আচমকা, প্রায় যেন আদিত্যর ছুরি খাওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্যে যে ভাবে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম—অনেকটা সেইভাবে বললাম: হ্যাঁ, আমি তোমায় ডাকছিলাম। পুলিসে ধরিয়ে দেবার জন্যে নয়, পাড়ার লোক তোমায় তাড়া করে ধরুক—তার জন্যেও নয়। আমি তোমায় একেবারে অন্য কারণে ডাকছিলাম। আমি তোমায় বলতে চাইছিলাম,—আমি তোমার চোখ দেখে বুঝেছি আদিত্য, তোমার ঘৃণায় খাদ নেই, একেবারে খাঁটি, বোধ হয় তার পরিমাপও নেই। তুমি আমায় কাওয়ার্ড বলেছ না? ইউ হ্যাভ কলড মী এ বাস্টার্ড, সান অফ এ বীচ। ইট ইজ অল রাইট; আই অ্যাম এভরিথিং। আই ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইওর হেটরেড্। জানো আদিত্য, আমি আমার হিসেবপত্র জানি: বাইরের খাতা নয়, ভেতরের খাতার কথা বলছি: আমি বাইরে যা রেখে যাব তাতে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার কষ্ট হবার কথা নয়। আমার নতুন বাড়ি হবে শীঘ্রি রিজেন্ট পার্কে, মনুর বিয়েতে হাজার পঁচিশ খরচ করব ইচ্ছে আছে, সোনাটোনা বাদ দিয়ে হাজার দশ। ইন্দু খেপে খেপে সোনা কিনছে, চোরাই সোনাও। মিনু এর আগে একটা কেরানী ছোকরার সঙ্গে মেলামেশা করার পর বুঝেছিল প্রেমট্রেম নিয়ে থাকলে তার

কপালে পঁচিশ হাজার নেই। এখন তাই মুখ ঘুরিয়ে বকুলদের দিকে আসা-যাওয়া করছে; রঞ্জন ছেলেটির কেরিয়ার আছে। 'আমার বড় ছেলে সুহাসকে আমি ভাল জায়গায় দিয়ে যাব। আর ছোটটা— তার কথা আপাতত আমি ভাবছি না। আমার রোজগারপাতি যে খারাপ নয়—বুঝতেই পারছ, মোটামুটি তিরিশ হাজার, ইনকামট্যাক্স রিটার্নে অবশ্য অত থাকতেই পারে না, থাকা উচিত নয়। ধরো, পারচেজিং অফিসার দত্তগুপ্ত সপ্তাহে একবার করে যে খামটা আমার হাতের পাশে রেখে যায় সেটার হিসেব নিশ্চয় আমি দেব না। আমি বাস্তবিক কতটুকু আর বাইরে কাগজে-কলমে দেখাতে পারি বলো? সেটা সম্ভব নয়। ধরো, মিসেস বাগচীর কথা। মুখার্জী যখন মিসেস বাগচীকে নিয়ে রসিকতা করে তখন আমার খারাপ লাগে; মানে আমার খানিকটা ঈর্ষা হয়। আসলে বাগচীর চেহারা টেহারা নিয়ে যেটুকু সুখ সে আমিই আড়ালে চোখে চোখে অনুভব করতে ভালবাসি। আমাদের মধ্যে একটা 'আনটোলড স্টোরি' আছে। না না, খারাপ কিছু নয়। যাই হোক, এটা সত্যি যে ইন্দুর জন্যে আমার ভালবাসার অভাব নেই।

আমি তোমায় কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম আদিত্য। হ্যাঁ— বলতে চাইছিলাম যে—আমি—আমরা যে দিব্যি পায়ের তলায় কবর খুঁড়ে ফেলেছি তাতে সন্দেহ নেই। ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু হেট্ আস্। কিন্তু তোমায় আমি বলছি আদিত্য, তুমি একেবারে অ্যামেচার, তুমি জানোই না কোথায়—ঠিক কোন জায়গায় মারতে হয়। ইউ ডু নট নো দি রাইট প্লেস। এ একেবারে যেখানে সেখানে এলোপাথাড়ি মার হচ্ছে। অকারণ, অনর্থক। এভাবে কী আমাদের মারা যায়?

কী জানি। আমি জানি না। আমার তো মনে হয়—তুমি আমার হাত পা জখম করতে, পেট ফাঁসাতে, মাথা ফাটাতে অনায়াসেই পারবে। হয়ত বুকের তলায় এক বিঘত

ছুরি ঢুকিয়ে দিতেও পারবে। কিন্তু তুমি একটা জিনিস পারবে না।

সেটা যে কী, তুমি জানো না।

আমি ঠিক জানি না কেন যেন এক বিশাল কান্না আজ আমার ছাপান্ন বছর বয়সে এসে আমার বুক ভেঙে দিল। হ্যাঁ, আমি ছেলেমানুষের মতন কাঁদছিলাম। ইন্দু, মিন্নু, সুহাস—ওরা অঘোর ঘুমে।

আদিত্যের জন্যে না আমার জন্যে—কার জন্যে অন্ধকারে এই কান্না এল কে বলবে!

সহচরী

আমি সব সময় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি। ছেলেবেলা থেকেই নানান স্বপ্ন দেখে আসছি: সে-সব স্বপ্ন সচরাচর যা হয়—কখনও মজার, কখনও ভয়ের, কখনও বা অন্য কিছুর। অদ্ভুত, অসম্ভব স্বপ্নও আমি অনেক দেখেছি। যেমন, ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম, আমার বাবা তাঁর পিঠ চোলকানোর হাড়ের লম্বা কাঠিটা মার মাথায় ছুঁইয়ে দিতেই মা সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর কুয়া হয়ে গেল। এটা আমায় ভীষণ অবাক করলেও ভেবে দেখেছিলাম, আগেকার দিনে যাদুর কাঠি ছুঁইয়ে বা কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে মানুষকে পশুপাখি পাথর করা গেলেও এখন আর তা করা যায় না। কিংবা যৌবনে আমি আবও অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখেছিলাম, আমাদের বাড়িতে ভীষণ আগুন লেগেছে, ঘরদোর পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, অথচআমি আমার ঘরে বসে পর্বতপ্রমাণ নরম তুলোর মধ্যে গুহার মতন একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে তার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। এসব স্বপ্ন আমার কাছে বরাবরই অদ্ভুত এবং অর্থহীন মনে হয়েছে। নয়ত কে কবে দেখেছে, আমারই শব চলেছে খাটিয়ায় দুলতে দুলতে আলো-অন্ধকারের তলা দিয়ে আর আমি সেই শবের পেছনে পেছনে একাই হরিধ্বনি দিতে দিতে চলেছি।

কিন্তু এখন, আমার এই যৌবনের শেষে এসে আমি যে স্বপ্নটি দেখলাম—তেমন স্বপ্ন আগে আর কখনও দেখেছি বলে আমার মনে পড়ছে না। আমি সরসীকে স্বপ্ন দেখলাম। সরসীকে আমি আগেও স্বপ্ন দেখেছি। মাঠে ঘাটে ঘরে বিছানায় সর্বত্র এবং সর্বভাবেই সরসীকে স্বপ্ন দেখলেও এভাবে কখনও দেখিনি। কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম: সরসী আমায় কোথায় যেন নিয়ে

গেছে। মনে হল তার বাড়িতে। সরসীর ঘরে আমার এক সময় শোওয়া-বসা ছিল। তার বিছানার মাথার দিকে একটা সুন্দর বাতিদান থাকত। এই বাতিদান ছাড়া আমার চোখে আর কিছু পরিচিত দ্রব্য না পড়ায় আমি জোর করে বলতে পারি না সরসী আমায় অন্য কারও ঘরে, অন্য বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল কি না! আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। এবং অপেক্ষা করছিলাম। সরসী এল। নির্বাস। আসার পর দেখলাম, সে বিনাবাক্যব্যয়ে আমার বুকের ওপর বসে চকচকে একটা ছোরা আমার বুকে এবং কণ্ঠনালীতে কয়েকবার বসিয়ে দিল। দিয়ে আমার দুটি হাত বিচ্ছিন্ন করে দিল, নিম্নাঙ্গ মাটিতে ফেলে দিল। কী আশ্চর্য, আমি কণ্ঠহীন, হৃদয়হীন, হস্তপদহীন দরজির দোকানের তুলোভরা নকল ঊর্ধ্বাঙ্গ মূর্তির মতন হয়ে পড়লেও সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। সরসী আমার কণ্ঠনালী কেটে ফেললেও তা বাতিল করে দেয়নি। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। শেষে দাঁতের ডাক্তারদের মতন সে আমার দাঁতের মাড়ি সমেত ওপর এবং নীচের পাটি দুটো খুলে নিল। আঙুলে করে একে একে দুটি চোখ তুলে নিল। তারপর সরসী আমার মুখচুম্বন ও অশ্রুপাত করতে করতে বলছিল: 'নবীন, আমি আজ বড় সুখী, বড় সুখী; তুই আমার লক্ষ্মী, তুই আমার সোনা, তুই আমার সর্বস্ব। তুই আমার কাছে কিছু চা, চেয়ে চেয়ে নে···।' এই বলে সে আমায় শিশুর মতন স্তন্যদান করতে যাচ্ছিল···স্বপ্ন ভেঙে গেল।

ঘুম ভেঙে জেগে উঠে অনেকক্ষণ আমি নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে ছিলাম। তখনও পুরোপুরি ভোর হয় নি। শুয়ে থেকে থেকে নিজের হাত পা, অন্যান্য অঙ্গ ও আমার ইন্দ্রিয়গুলি অটুট আছে কিনা তা স্পষ্ট করে অনুভব করতেও আমার ভয় করছিল। সরসী হয়ত আর নেই, কিন্তু চোখ মেলে উঠে বসার পর যদি আমায় নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে খাটের নীচে থেকে খুঁজে বের করে নিতে হয়

তবে সে বড় মুশকিল হবে। কোথায় কী ছড়িয়ে আছে তা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। রাত্রে শুতে এসে আমি পায়ের চটি জোড়া বরাবরই খাটের তলায় খুলে রাখি। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি চোখে চটি জোড়া খুঁজতেই আমার অর্ধেক দিন হাতড়াতে হয়। এইরকম যার অবস্থা—তার পক্ষে অতগুলো জিনিস ঠিক ঠিক খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার। তা ছাড়া আমার কোমরের তলা থেকে নীচের অংশটা নেই; আমার পক্ষে বিছানায় উঠে বসাই বা কী করে সম্ভব? হায়রে, আমি কত বড় মূর্খ দেখুন; আমি যে বলছি উঠে বসে আমি সব খুঁজে নেব, কিন্তু কী করে খুঁজব, আমার চোখ কোথায়? সরসী আমার দুটি চোখই যে তুলে নিয়ে সরিয়ে রেখেছে কোথাও। সরসীর ওপর আমার প্রবল রাগ ও ঘৃণা হচ্ছিল।

ক্রোধ কিংবা ঘৃণা প্রবল হয়ে উঠলে অনেক সময় নিজেকে অনুভব করা সহজ হয়। সরসীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার পর আমার স্বপ্নাবেশ সম্পূর্ণভাবে কেটে গেল। অনুভব করলাম, আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অক্ষত আছে। তারপর চোখ খুলে তাকালাম। শরতের ধবধবে সকাল আমার ঘরে এসে মশারির কাপড় দুলিয়ে দিচ্ছে। কিঙ্করবাবুদের বাগানে পাখিরা ডাকাডাকি করছিল। কোথাও একটা রিকশা যাচ্ছে, যেতে যেতে তার ঠুনঠুনি বাজাচ্ছিল বাউল বৈরাগীর মতন। আমার মন তখন কানায় কানায় জেগে উঠেছে। সরসী এবং স্বপ্ন দুই-ই আমি কিছুক্ষণের জন্যে একেবারেই ভুলে গেলাম; আর কী আশ্চর্য যে এখন শরৎকাল, আশ্বিন মাস চলছে—এসব মনে পড়ে যাওয়া মাত্র বেশ লাগছিল। শরৎকাল আমার বরাবরই ভাল লাগে এবং এই আশ্বিন মাস। আশ্বিনে আমার জন্ম। বাংলা মাস বলে তারিখটা আমি খেয়াল করতে পারলাম না; আমার জন্মদিনের হিসেবটাও তাই ঠিক করা গেল না। হালকা এবং খুশী মনে আমি ছেলেবেলার মুখস্থ করা

সেই পদ্যটা—'আজিকে তোমার মধুর মুরতি' মনে মনে আওড়ে নিলাম। আওড়াবার সময় 'অমল শোভাতে' কথাটা মনে আসার পর এই আচমকা-জ্বলে-ওঠা খুশীর সলতেটুকু দপ করে নিবে গেল। শোভা আমার মার নাম—পুরো নাম শোভাময়ী। মাকে মনে পড়ার পর দু' চারটি স্মৃতি দূরে গোচারণের মাঠের কয়েকটি গাভীর মতন বিচরণ করছিল, সহসা সরসীকে আবার মনে পড়ল। এবং বিগত রাত্রের স্বপ্নটিও। বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় আমি অনুভব করছিলাম: আমার হাত পা বুক দাঁত চোখ সব যথাযথ অবস্থায় থাকলেও কিছু একটা ঘটে গেছে—যার ফলে আমি আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বাভাবিক আয়ত্তের মধ্যে পাচ্ছি না।

এই অবস্থায় আমার সকাল কাটল। আমি অবিবাহিত, সাংসারিক পরিবেশ আমার বাড়িতে নেই। নিরিবিলিতে আমি সকালের কাগজ দেখলাম, বাহাদুর পুলিস এবং ততোধিক বাহাদুর জনতার প্রস্তরযুদ্ধের একটি বড় ছবিও দেখলাম মনোযোগ দিয়ে, বিখ্যাত নেতাদের অর্থহীন দু একটি কথাও চোখে পড়ল, বাস দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের সংবাদটি দেখে নেবার সময় নিজের ভাগ্য সম্পর্কেও আমার হতাশা এল। এইভাবেই চলছিল: চা খাওয়া, দাড়ি কামানো, স্নান ইত্যাদি শেষ হলে বঙ্কু এসে খাবার কথা বলল। বঙ্কুই আমার গৃহ-রক্ষক। বলতে কি, যদিও আমি নিত্যদিনের মতন প্রাত্যহিক কর্মগুলি করে যাচ্ছিলাম তবু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি ক্রমাগত বাড়ছিল। আমি স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না; রাত্রের সেই অদ্ভুত, অস্বস্তির স্বপ্নটি আমার চেতনার ওপর পুরু সরের মতন জমে যাচ্ছিল। যখন অফিসে যাচ্ছি, কলমটা তুলে নেবার পর বুক পকেটে রাখতে গিয়ে আচমকা অনুভব করলাম, আমার কী যেন—কিছু যেন হারিয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে এত ভয় হল যে হাতটা বুকের ওপর জোর করে চেপে রেখে অনুভব করলাম, হৃদপিণ্ডটা যথাস্থানে আছে কি না, স্পন্দন আছে অথবা নেই। স্পন্দন ছিল, কিন্তু হৃদপিণ্ড যা আমার বলেই এ-যাবৎ জেনে এসেছি সেই হৃদপিণ্ডই যথার্থ রয়েছে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে কিনা সে বিষয়ে আমার যেন সন্দেহ দেখা দিল।

আমার নাম নবীন। আমি বিখ্যাত এক বিদেশী ওষুধ কোম্পানীর হিসেবপত্র দেখাশোনা করি। অফিসে আমার নিজের জন্য ছোট একটি বাহারী কুঠরি আছে, ফোন আছে, একটি দীর্ঘাঙ্গী বাঙালী যুবতী আছে টাইপের কাজকর্ম করার জন্যে; উপরন্তু ক্লান্তি বিনোদনের জন্যে একপাশে একটি আর্ম চেয়ার রয়েছে। কখনও কখনও আমি স্বভাবতই বিকেলের পর বীজাণুনাশক সাবানে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার টাওয়েলে মুখ পরিপাটি করে মুছে নিয়ে মাথার চুল আঁচড়ে আর্ম চেয়ারে আরাম করে বসে চা, স্ন্যাকস এবং সিগারেট খেতে খেতে আমার টাইপিস্ট মিসেস গুহর সঙ্গে জামাই-বাবুর মতন রসিকতা করি, এবং আমার এই অনাত্মীয় শ্যালিকাটির সদানন্দ শরীরে স্নেহদান করি।

আজ অফিসে এসে আমার কোনো কিছুতেই মন বসছিল না। কাজকর্ম চাপা দিয়ে রেখে বা অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে বসে বসে আমি স্বপ্নের কথা ভাবছিলাম। মাথাটা অবেলাতেই ধরে উঠল। দুটো অ্যাসপিরিনের বড়ি খেলাম। কাগজপত্র কিছু কিছু সই করার সময় আমার মনে হচ্ছিল, আমি নিজের হাতে সই করছি না। এমন কি মিসেস গুহ যখন একবার এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি শরীর খারাপ?' —তখন আমার মনে হল, আমি নিজের চোখ দিয়ে মিসেস গুহকে দেখছি না। ওকে যে চোখ দিয়ে দেখছিলাম সেটা কোনো ক্রমেই আমার চোখ হতে পারে না।

কমলবাবু বয়সে আমার বড় হলেও কেরানীবাবু। ভদ্রলোক

দুটি জিনিস অত্যন্ত ভাল বোঝেন, কোষ্ঠীবিচার এবং কলকাতার ঘোড়া-মাঠ। আমায় বরাবরই বিশেষ স্নেহ করেন। এক সময় কমলবাবু এসে বললেন, "আপনার নাকি শরীর খারাপ হয়েছে, স্যার? এখন কলকাতায় খারাপ টাইপের একটা ডেঙ্গু হচ্ছে। কেউ কেউ বলছে ভিয়েতনামের দিকে আমেরিকানরা ভাইরাস ছেড়েছে। এক্সপেরিমেণ্ট হিসেবে।···আপনি বরং বাড়ি চলে যান, গিয়ে দুটো নভেলজিন খেয়ে শুয়ে পড়ুন। রেস্ট নিন। একটা পাঁচশো মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি'-ও খেয়ে নেবেন।"

কমলবাবুর ওপর আচমকা আমার কী যে হল—'ইউ শাট আপ, শালা, শূয়ারের বাচ্চা' বলে লাফ মেরে তাঁকে ধরতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না, চেয়ারে পা লেগে পড়ে গেলাম। কমলবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারপর অফিসে একটা বিশ্রী কাণ্ড। বড়রা ছুটে এলেন, ছোটরা এলেন। 'কী হয়েছে? ফিলিং আনইজি? ডাক্তার ডাকব? ইনস্যানিটির ফার্স্ট সাইন নাকি রে বাবা? ইউ জাস্ট গো হোম মুখার্জী; টেক সাম রেস্ট।'···কী বিশ্রী বলুন তো!

আপনারা যান; প্লীজ গো। আমি ভাল আছি। ফীলিং ফাইন। কমলবাবুকে একবার ডেকে দিন। কমলবাবু, আমি খুবই দুঃখিত, আসলে আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারি নি, খুব অন্যমনস্ক ছিলাম, তা ছাড়া আমার গলা আজ ঠিক আমার গলা বলে আমারই মনে হচ্ছে না। আপনি আমায় মাপ করুন।

অফিসে আমি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলাম না। বিকেল নাগাদ বেরিয়ে পড়ার সময় মিসেস গুহকে ঘরে ডেকে পাঠিয়ে পার্টিশানের গায়ে চেপে ধরে একটা চুমু খেলাম। খাবার অন্য কোনো কারণ ছিল না, শুধু দেখতে চাইছিলাম—সরসী কাল যেভাবে আমার দু পাটি দাঁত খুলে নিয়েছিল তারপর আজকের পাটি দুটো নকল না আমার নিজস্ব। চুমুটা এতই বিস্বাদ যে এক চামচ

মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়ার মতন মুখে লেগে থাকল। স্বভাবতই আমার মনে হল—দাঁতের পাটি দুটো আমার নয়।

অফিস থেকে বেরিয়ে নীচে একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাবার পর আমার মনে হল, এখনই, এই মুহূর্তে আমার সরসীর কাছে যাওয়া দরকার। সরসীর ওপর রাগে আমার গা ভীষণ জ্বরের মতন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। সরসী একটা জাঁহাবাজ, শয়তান, ডাইনী টাইপের মেয়েছেলে। বীচ। সে আমার অনেক কিছু চুরি করে নিয়েছে, ডাকাতি করে কেড়ে নিয়েছে, নিয়ে কতক নকল—ফল্‌স মাল ভরে দিয়েছে। তুমি কি ঘড়ি সারাইয়ের দোকান খুলেছ? নাকি তুমি আমায় অচল ঘড়ি পেয়েছ যে হাতে পেয়ে আমার কলকব্জা সব খুলে নিয়ে পটাপট কতকগুলো বাজে মাল ভরে দেবে? চোর, চোট্টা মেয়েছেলে কোথাকার!

ট্যাক্সি খানিকটা চলে আসার পর আমার খেয়াল হল, এখন সরসীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া বৃথা। এ সময় তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে না। সে নিজের কাজেকর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইনসিওরেন্সের মেয়ে এজেন্ট হিসেবে তার কাজকর্ম ভাল—বেশ ভালই চলে। সরসী কোথায়, কার সঙ্গে বসে কিম্বা দাঁড়িয়ে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার, কিংবা লাখের বিজনেস শেষ করার চেষ্টা করছে কে জানে। তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় এটা নয়।

তাহলে?

আমি ট্যাক্সিটাকে পার্ক স্ট্রীটে যেতে বলে দিলাম। আপাতত ঘণ্টা দেড় দুই মদ্যপানে কাটানো ছাড়া উপায় নেই।

সরসীর সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা-সাক্ষাত নেই। অন্তত বছর খানেক। শেষ দেখা হয়েছিল আচমকা খড়গপুর স্টেশনে, দুজনেই দীঘা বেড়াতে যাচ্ছিলাম। দিন চারেক দীঘায় সরসীর সঙ্গে থাকা গিয়েছিল। মন্দ নয়, ভালই কেটেছিল। বিশেষ করে রাতগুলো। সরসী আজকাল তার চর্বি কী পরিমাণ সংযত রাখছে

তা দেখে অবাক হয়েছিলাম। না, আমার ভুল হল, দীঘার পরও বার দুই ছোট ছোট দেখা—বা যাকে বলা যায় 'ব্রিফ এনকাউণ্টার' হয়েছে। এই তো নতুন বর্ষায় সরসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ; অল্প সময়ের জন্যে হলেও তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেই শেষ। ইতিমধ্যে দু-চারবার ফোনে কথাবার্তা হয়েছে। মামুলি কথা।

আসলে দুপুরে অফিসে বসেই উচিত ছিল সরসীকে একবার ফোনে ধরার। ফোনে পাওয়া গেলে কথা বলা যেত : 'সরসী? সরসী নাকি? সরসী, আমি নবীন কথা বলছি। আমার গলা চিনতে পারছ না? না পারার জন্যে আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি বলো। আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি। এ তুমি কী করেছ? কাল তুমি আমায় নিয়ে এসব কী করেছ? আমি বুঝতেই পারি নি তুমি এরকম করবে। কী সাংঘাতিক। বীস্টলি! তুমি আমার সমস্ত কিছু কেটেকুটে ছিঁড়েখুঁড়ে সরিয়ে নিয়েছ ; আজ সকালে উঠে দেখি, আমি আমার নিজের কিছু আর খুঁজে পাচ্ছি না, বেটার আই শুড সে আই পজেজ নাথিং অফ মাই ওউন। এর মানে কী? তোমার উদ্দেশ্যটা কী? কোন শালা পাগলার মালপত্র আমার মধ্যে ফিট করে দিয়েছ? সরসী, তুমি ভীষণ খারাপ কাজ করেছ! তুমি শয়তান, নৃশংস, পশু ; ইউ আর এ বীচ ; শালী, খচড়ি মাগী কাঁহাকা…'

দমকলের গাড়ির ঘণ্টা অনবরত বাজতে থাকায় আমার হুঁশ হল। পার্ক স্ট্রীট দিয়ে ট্যাক্সিটা চলেছে। উলটো মুখ দিয়ে দমকলের গাড়িগুলো ছুটে গেল। আকাশে কোথাও মেঘ হয়েছে। বিকেলটা মেঘলা হয়ে গিয়ে পার্ক স্ট্রীট ঘোলাটে দেখাচ্ছিল। সরসীর কথা আমার দুপুরে মনে পড়লেও আমি ফোন না করে ছেলেমানুষী করেছি, নাকি তখনও আমার কী কী খোয়া গেছে তা স্পষ্ট বুঝতে না পারার জন্যে ফোন করতে পারিনি—ঠিক যে কী কারণে সরসীর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি তা বুঝতে পারলাম না।

আই ট্যাক্সি, থামো, রোকো।

ট্যাক্সি থেমে গেল। আমি নবীন, ট্যাক্সিঅলাকে ভাড়া মিটিয়ে 'বার'-এ ঢুকে গেলাম।

সচরাচর আমি হুইস্কি খাই। আজ হুট করে 'রাম' চেয়ে বসলাম। সামান্য খাবার পর আমার মনে হল, এ আমি খাই না, গৌর খায়। 'রাম' খাওয়ার পর গৌরের গায়ের সমস্ত লোমকূপ দিয়ে গন্ধ বেরোয় ঘামের সঙ্গে। আই হেট ইট। আমি 'রাম' খাই না, আমি গৌর নয়, তবে কেন 'রাম' খাচ্ছি। নিশ্চয় আজ আমি আমাতে নেই, সরসী আমাকে নবীনের পোশাক পরিয়ে রেখেছে : আসল নবীন কোথায় ?

রাগের মাথায় আমি উলটো পালটা যখন যা খুশি খেয়ে যখন 'বার' থেকে বেরোলাম তখন বাস্তবিকই আমি সবই হারিয়ে ফেলেছি। এ একটা মজার নবীন। তোমরা দেখো, উনপঞ্চাশ বছরের লম্বা চেহারার লোকটাকে এবার দেখো। নবীন মুখার্জি। শালার গায়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটের ইব্রাহিম আলীর তৈরী কোট, টেরি-কটের ট্রাউজার্স, ইজিপসিয়ান কটনের সাদা শার্টের বোতাম খোলা, টাইটা ট্রাউজার্সের পকেট থেকে বেরিয়ে লেজের মতন পেছনে ঝুলছে। লোকটা তার চশমা ফেলে এসেছে, মাথার চুল উসকোখুসকো, চোখমুখ ফুলে টসটস করছে, শালা নবীন মুখার্জি ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে ট্যাক্সি ডাকছে হাত নেড়ে নেড়ে। তার গলা উঠছে না ; সে দুলছে। আর মাঝে মাঝে বলছে : আই অ্যাম্ লস্ট ...আই অ্যাম্ রবড অফ...হেই ট্যাক্সি—ট্যাক্সি...।

ট্যাক্সিটা পেয়ে যাবার পর আমি গদির মধ্যে গিয়ে গড়িয়ে পড়লাম। ল্যান্সডাউন রোড ; আমায় সরসীর বাড়ি নিয়ে চলো ট্যাক্সিঅলা। দেশপ্রিয় পার্কের আগে।...শোনো ট্যাক্সিঅলা, যদি

সরসী বলে—এ লোক নবীন নয়, তুমি বলবে—হ্যাঁ এ নবীন—নবীন মুখার্জি। সাহেবকে আমি চিনি। তার অফিস চিনি, বাড়ি চিনি। এই সাহেবই নবীন মুখার্জি, আলবাত…। আমি বলি কি, তুমি একটু ঘুরে-ফিরে চলো। সরসী এখনও বাড়ি পৌঁছে গেছে কিনা কে জানে। সরসীর কাছে যাবার আগে আমি তৈরী হয়ে নিতে চাই, আমার মগজ পরিষ্কার হওয়া দরকার। সে যেন না ভাবে আমি মাতলামি করতে গিয়েছি। আমার যুক্তিটুক্তি অটুট থাকা দরকার। সরসীর কাছে আমি এক্সপ্লানেসান চাইব। আমি জানতে চাইব, এসব কি? কেন তুমি আমার সমস্ত কিছু কেটে-ছিঁড়ে নিয়েছ? এটা কোন ধরনের রসিকতা? কী খেলা?

আমি বোধ হয় তখন 'কী খেলা—কী খেলা তব—' বলে একটু গান গাইবার চেষ্টা করছিলাম, একপাল বুনো ঘোড়া ছুটে আসার মতন তেড়ে বৃষ্টি এসে গেল। আঃ, মার্ভেলাস! কী বৃষ্টি! ফাইন জলো বাতাস এসেছে…না না, ট্যাক্সিঅলা তুমি কাচ তুলে দিও না। মুখে চোখে একটু জল বাতাস লাগতে দাও। আমি তোমায় টাকা দেব, একস্ট্রা টাকা। এই বৃষ্টি সুন্দর! কী ভালো, কী ভালো! এটা আশ্বিনের বৃষ্টি। আশ্বিন আমার জন্মমাস। কে বলতে পারে আজ আমার জন্মদিন নয়? হয়ত আজই আমার জন্মদিন। আমি বাংলা তারিখ না জানার জন্যে বুঝতে পারছি না। সরসী জানতে পারে। সরসী আগে জানত। এখন বোধ হয় ভুলে গেছে।

অ্যাই ট্যাক্সিঅলা, তুমি শালা ঘুমোচ্ছ নাকি, দেখছ না লাল আলো হয়ে গেছে। ছুটে পালালেই হল! দাঁড়াও। অপেক্ষা করো। বৃষ্টির মধ্যে বাহাদুরী করতে যেও না। সামলে চলো। তুমি উজবুক জানো না, তোমার ট্যাক্সিতে কাকে নিয়ে যাচ্ছ! নারে ভাই, আমি মন্ত্রীফন্ত্রী নই, কংগ্রেস কমিউনিস্ট নেতাও নই, সিনেমা অ্যাক্টর নই। আমি নবীন মুখার্জি। আমি নবীন মুখার্জি হলেও তুই জানিস নারে ভাই, কী মাল তুই নিয়ে যাচ্ছিস! বেটার সে—

বহন করছিস। তুই জানিস না, এই নবীনের তলায় অরিজিন্যাল কিছু নেই। সরসী বিলকুল সব খুলে নিয়েছে, বাতিল করে দিয়েছে, দিয়ে তার ফল্‌স মাল ঢুকিয়ে দিয়েছে। না দিলে মার্ডার চার্জে পড়ত। এখন আর পড়বে না। বরং কে বলতে পারে আগামী কালের কাগজে সরসীর ছবিটবি দিয়ে তার বিরাট কীর্তির কথা বেরোবে না। অবিশ্বাস্য কাণ্ড করেছে রে ভাই সরসী, নবীন মুখার্জির কিছু আর বাকি রাখে নি, সমস্ত কেটেকুটে ফেলে নতুন করে আবার তার খুশি মতন জিনিস ভরে দিয়েছে। কী বলে যেন আজকাল? ট্রান্সপ্ল্যান্টেশান। তবে তাই। এর ফলে এই যে দেখছ, আমি তোমার ট্যাক্সিতে শুয়ে শুয়ে যাচ্ছি, আমি একটা মহা মূল্যবান জিনিস হয়ে গেছি, মানুষের কাছে, সভ্যতার কাছে। তাই বলছি, মানবসভ্যতার কত বড় কীর্তিকে তোমার ট্যাক্সিতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছ, তুমি জানো না।

জোর বৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক যেন বুনো ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে এলোমেলো ছোটার মতন ছুটছে। ভিজে-মাথা গাড়িগুলো ছুটটে বাড়ি পালাচ্ছে। নিয়নগুলো তোমার চোখের সামনে হাসুক, নাচুক, চোখ টিপুক —তুমি ভাই ধীরে সুস্থে, ঘুরেফিরে চলো ট্যাক্সিঅলা। লোকজন বাঁচিয়ে। যেতে যেতে যদি শুনতে চাও আমি কোথায় যাচ্ছি, শোনো।

আমি যাচ্ছি সরসীর কাছে। 'সরসী আরসী মোর' সেই সরসীর কাছে। সরসী আমার কিশোর বয়সের বান্ধবী। সখী, সহচরী। সে আমার চেয়ে বছর খানেকের বড় হলেও হতে পারে। এক সময় তাকে আমি দিদি বলতাম, সরসীদি। তখন মা বেঁচে ছিল। পরে সরসী সরসী করেছি। ও আমায় তুই বলত, তুমি বলত ; আমিও ওকে তুই তুমি বলেছি। আর খানিকটা বয়স বাড়তেই 'সরসী আরসী মোর'। এটা অবশ্য ঠাট্টা করে বলা। তবু বলা চলে ওকে দেখে আমার নিজেকে দেখতে শেখা। কিন্তু

সেইটুকু শেখা যেটুকু ওর ঠোঁট গাল বুকটুক শেখায়। তার বেশি আমি শিখি নি। শেখা কি উচিত ছিল? না। আমি মনে করিনি উচিত ছিল। আমি বরাবরই একটু দেহতত্ত্ব সম্পর্কে উৎসাহী। না ভাই, দেহতত্ত্বর গানটান যে লাইনে হয় সে লাইনে নয়; আমি অন্যভাবে বলছি। দেহ-বিজ্ঞানের ছবিটবি দেখা বা পড়ার মতন আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সরসীর হাত পা কোমর দেখতে পারতাম। যখন ও পূর্ণ যুবতী, তখন বিবসনা সরসীকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, ওর সব কিছুই নির্দিষ্ট, নিয়মিত; এমন কি তার সামান্য স্ফীত গোলাপী রঙের উদর খাদ্য পরিপাক এবং বংশবৃদ্ধির জন্যেই গঠিত। আমি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়েই অভিভূত বা উন্মত্ত হতাম না। সরসী আমার সখী ও সহচরী হিসেবে অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার মধ্যে আমি ঝাঁপ খেয়ে পাতালে যেতে রাজী নয়। সরসী আমায় কী বর্ষা, কী শীত, কী বা বসন্তে তার সমস্ত মায়া মোহ লজ্জা দিয়ে অধিকার করার চেষ্টা করেছে। পারেনি। আমার বাবা তখন মৃত। আমি পয়সাকড়ি মোটামুটি ভালই পেয়েছিলাম। আমি সুখের জন্যে তার অধিকাংশটাই খরচ করেছি। সুখ সব সময়ই ক্ষণস্থায়ী। তাতে কী! এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে যে, আমায় দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থায় যেতে হবে। সরসীকে আমি অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিছু লোক—যারা হয় ঠগ না হয় জোচ্চোর অথবা অক্ষম অসহায়—তারা তাদের দল ভারি করার জন্যে সুখকে দুয়োরানীর মতন করিয়ে সাজিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তা নয়, সুখ নোংরা বা ছোট নয়। জগতটা সম্পর্কে আমার বিচার আলাদা। আমি যখন তাস নিয়ে বসেছি তখন সব তাসই আমার কাছে তাস, আমি তাস তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে খেলে যাব। আর আমি তাই খেলেছি। আমি কিছুই গ্রাহ্য করিনি। এই করে করে বয়েস বেড়ে গেল, সরসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাঙল, জুড়ল, আবার ভাঙল, আবার জুড়ল। কিন্তু সেটা পাতলা হয়ে

গেল। আমারই ভাবতে অবাক লাগে, সরসী কেন বরাবরের মতন সম্পর্কটা ভেঙে দিল না।

বৃষ্টিটা বোধ হয় কমে এসেছে। আশ্বিনের বৃষ্টি এই রকমই। আসে যায়, আবার আসে। সরসী আর আমার সম্পর্কের মতন অনেকটা।···যা বলছিলাম, আমাকে ভীষণ অত্যাচারী, পাপীতাপী, পশুটশু ভাবার কোনো কারণ নেই। আমি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতন না হলেও উৎসাহী প্রাণবান, সমর্থ যাত্রীর মতন সুখের সমস্ত সাধারণ রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার দুঃখ, অনুতাপ, অনুশোচনা নেই। আমি কারও ক্ষতি করিনি, কাউকে খুন করিনি, কোনো গর্হিত অপরাধ নয়। আমি কোনো কিছুই বিশ্বাস করি না। প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, আত্মত্যাগ, আদর্শ—এইসব আর কী। এমন কি, তুমি ভেব না আমি নারীর শরীরেও বিশ্বাস করি। তাও করি না। আমি কী নিজের শরীরকেই বিশ্বাস করি। যদি করতাম, আমার এই জলজ্যান্ত দেহটা মড়ার খাটিয়ায় তুলে দিয়ে আমি নিজেই হরিধ্বনি দিতে দিতে যেতাম না।

কোথায় এলাম?···আচ্ছা, আচ্ছা আর-একটু এগিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিটা থামিয়ে দিও।···শোনো হে ট্যাক্সিঅলা, তুমি কি বুঝবে কথাটা, তবু শুনে রাখো, ফাঁকা ঘরে তোমার ঘুমের জন্যে বিছানা আশা করো না, যেখানে পারো শুয়ে পড়ো, নয়ত বসে থাকো।··· এই দুনিয়ায় আমরা ফাঁকা ঘরে এসেছি।

হ্যাঁ এইখানে। এখানেই থাম। তুমি একটা চমৎকার ট্যাক্সিঅলা। ···আচ্ছা ভাই, আসি···

সরসা তখনও ফেরেনি।

সরসীর বাবা তাঁর ঘরে আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে গুনগুন করে হরি-নাম গাইছিলেন।

"কে, কে গো তুমি?"

"নবীন।"

"নবীন!...কেমন আছ তুমি? অনেকদিন এদিকে আসনি। এসো বাবা, বসো।"

"সরসী ফেরেনি?"

"এখনও ফেরেনি; ফেরার সময় হয়ে গেছে। তুমি বসো।"

"আমি বরং নীচে রাস্তায় বেড়াচ্ছি।...দেখি সরসী আসছে কিনা।"

আমার গা গুলিয়ে বমি আসছিল; সরসীর বাবার ঘরে বমিটমি করে ফেলার চেয়ে নীচে রাস্তাঘাটে বমি করাই ভাল। তাছাড়া এই বুড়ো লোকটার ঘরে বসে তার হরিনাম শোনার ধৈর্য আমার নেই। মুখ থেকে খারাপ গালাগাল টালাগাল বেরিয়ে যেতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময় আমার মনে হচ্ছিল, প্রায় আশি বছর বয়স হতে চলল সরসীর বাবার। এখনও বুড়ো কোন আশায় বেঁচে আছে। কী লাভ এই বেঁচে থাকায়? হরি ছাড়া তার সঙ্গী নেই; আর হরিও এমন সঙ্গী—যে, বুড়ো যদি এখন হুট করে মরে যায়—তার হরি দেখতে আসবে না। তবু বুড়ো তার হরি নিয়ে আছে।

রাস্তায় নেমে দেখি ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে আবার। আমি ভাল মতন দেখতে পাচ্ছিলাম না। চশমাটা কোথায় ফেলে এসেছি কে জানে; হাতটা খালি খালি লাগছে, ফোলিও ব্যাগটা কী

ট্যাক্সিতেই পড়ে থাকল? নাকি বার'-এ ফেলে এলাম?···দূর শালা, এ হাত কি আমার? কার হাত আমার কাঁধে ঝুলছে কে জানে! সরসী তাড়াহুড়োয় ডান বাঁ, বাঁ ডান ঠিক মতন দেখে জুড়েছিল কি না কে জানে! বোধ হয় নয়; জুড়লে আমার এরকম অস্বস্তি লাগছে কেন? হাঁটতে, হাত তুলতে, কোমরটা ঘোরাতে এমন বেকায়দা লাগার কথা নয়।

হাঁটতে, চলতে, দেখতে আমার এতই অসুবিধে হচ্ছিল যে আমি রাস্তার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে কোমর ভাঙা নুলো ভিখিরি-টিখিরির মতন যাচ্ছিলাম। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। চুল, মাথা, মুখ, কোট প্যান্ট সবই ভিজে গেছে আমার। গাড়িটাড়িগুলো চলে যাবার সময় এমন করে আমার ওপর আলো ছুঁড়ে যাচ্ছে যেন আমি কোনো ফেরারী আসামী, পালিয়ে যাচ্ছি. পুলিসের গাড়ির সার্চ লাইটের মতন তারা আমায় দিশে করে নিচ্ছে।

সরসী, সরসী!···না, ও সরসী নয়। ট্যাক্সিটা আমার গায়ের পাশ দিয়ে ঘুরে গলির মধ্যে ঢুকে গেল। পাশের দোকানে ছাতা মাথায় কতক লোক দাঁড়িয়ে, বাস গেল পর পর দুটো, পায়ের তলার মাটি কাঁপছিল, ঝকঝকে দোকানটার মধ্যে রেকর্ড বাজছে: 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন···'

সরসী! এই সরসী!···না, ও সরসী নয়। রিক্সাটা ঠুনঠুন করে চলে গেল।

বৃষ্টি বুঝি থেমে গেছে। আকাশে কোথাও মোলায়েম করে মেঘ ডেকে গেল। এখন অনেকটা ঝাপসা অন্ধকার, মস্ত বাড়ির পাঁচিল টপকে গাছের ডাল দুলছে। এখানে আপাতত আমায় দাঁড়াতে হল, তারপর মাটিতে বসে পড়ে খানিকটা বমি করলাম। বমি করার পর ভীষণ তৃষ্ণা বোধ হল। বুক যেন ফেটে যাচ্ছে।

কাছাকাছি কোনো পানের দোকান থেকে একটা সোডা বা লেমনেড খাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম আবার।

সরসী বড় বেশী দেরী করছে। এত দেরী করা ওর উচিত নয়। এখন রাত হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আরও রাত হয়ে যাবে, এরকম এলোমেলো বৃষ্টি, আকাশে মেঘ, হু হু ঠাণ্ডা বাতাস ছুটছে, সরসী তোমার আর দেরী করা উচিত নয়। তোমার বাড়ি ফিরে আসা দরকার। আমি—নবীন তোমার জন্যে আমার সহ্যের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এখন বাস্তবিক পক্ষে আমার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা লাগছে, ভীষণ ফাঁকা; আমার হাত পা আর আমাকে টানতে পারছে না, আমার শীত করছে, চোখে দেখতে পাচ্ছি না, আমি আছি কি নেই—এ বোধ আমার হারিয়ে যাচ্ছে। তোমার উচিত এখন ফিরে আসা; ফিরে এসে আমায় বলো কেন তুমি আমার সঙ্গে এই নৃশংস, ইতরের খেলা খেললে? কোন অধিকারে তুমি আমায় একটা ফলস নবীন মুখুজ্যে তৈরী করে ছেড়ে দিয়েছ।

এ রাস্তায় পানের দোকান পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন আমার মনে হল, বমির একটা বিশ্রী দমক এসে মাথার মধ্যে কোথাও চাপা খোঁচা মেরেছে। মাথায় খোঁচা খেয়ে খেয়াল হল, একেবারেই আচমকা, যে—আমার হাত পা নেই, নিম্নাঙ্গ কোথাও খুলে পড়ে আছে, গলার কণ্ঠনালী কাটা, বুকের কাছটা গর্ত মতন, হৃদপিণ্ড খোওয়া গেছে, মুখের দু পাটি মাড়ি খোলা, চোখ নেই···। সরসী সমস্তই কেটেকুটে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হায় হায়, আমি এই অন্ধকারে কোথাও তা খুঁজে পাচ্ছি না, খুঁজতেও পারছি না···। সরসী, শয়তান মাগী কোথাকার, ইউ বীচ; ইউ···। দাঁড়াও, আমি বলছি তুমি দাঁড়াও। আমি তোমায় এবার দেখতে পেয়েছি, তুমি আসছ···

এরপর বোধ হয় ভুল করে আমি রাস্তার আলো অন্ধকারে কোনো মহিলাকে গিয়ে জাপটে ধরে ফেলেছিলাম। তার আচমকা চিৎকারে এখান ওখান থেকে কিছু লোক ছুটে এল। একটা ট্যাক্সি তখন রাস্তার কুকুর চাপা দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমায় কেউ প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি মারল। মেরেই চলল। চুলের মুঠি ধরে লাথি মারল কোমরে। পেটে মারল। তখন আমি রাস্তার মাটিতে। আমার বুকের ওপর বসে কে যেন চুলের ঝুঁটি ধরে রাস্তায় মাথা ঠুকে দিচ্ছিল। তোমরা আমায় কেন মারছ? আমি নবীন মুখুজ্যে। ভদ্রলোক। আমি সরসীকে খুঁজতে এসেছি। বিলিভ মী।

শালা মাতাল, লোফার, লোচ্চা; মার শালাকে, মেরে ফেল। ভদ্দরলোকের মেয়েকে জড়িয়ে ধরা। শালার প্যান্ট খুলে নে। মাইরি, কী গন্ধ বেরুচ্ছে রে বমির। ছেড়ে দে মণ্টা, মাতালটা পড়ে থাকুক রাস্তায়, লরিতেই খতম হয়ে যাবে।

আমার হাত, পা, মাথা, মুখ, বুক কিছু আর থাকল না; সব যেন জোড় থেকে খুলে ফেলে দিয়ে ওরা চলে গেল। আমার তখন জ্ঞান শেষ হয়ে এসেছে।

কতক্ষণ পরে যে পাতলা একটু চেতনা ফিরেছিল জানি না। ইলশেগুঁড়ির মতন বৃষ্টি হচ্ছে, অল্প দূরে একটা আলো জ্বলছে রাস্তার, শব্দ তুলে এক আধটা গাড়ি বুঝি চলে গেল। তারপর আর নেই, নিস্তব্ধ নির্জন।

কার যেন পায়ের শব্দ আসছিল। শব্দটা আমার কাছে এল, গায়ের পাশ দিয়ে চলে গেল।

চলে গিয়ে থামল, আবার ফিরে আসছিল, খুটখুট শব্দ হচ্ছিল। শব্দটা আমার মাথার কাছে এসে থামল।

কে যেন রাস্তার পাশে আমার-গায়ের ওপর নুয়ে পড়ছে। সে অনেকটা নীচু হয়ে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লে মনে হল, সরসী। সরসী এসেছে।

সরসী তুমি এসেছ। এই দেখো, আমি তোমার নবীন রাস্তায়

পড়ে আছি। আমার হাত পা নেই; আমার গলা জবাই করা ছাগলের মতন প্রায় দু খণ্ড; আমার বুক দেখো—মস্ত গর্ত, হৃদপিণ্ড নেই; আমার মুখ চুপসে আছে, মাড়ি বা দাঁত নেই; আমার চোখের মধ্যে তুমি তোমার আঙুল ডুবিয়ে দিতে পার।

সরসী, তুমি আমার এই অবস্থা করেছ। তুমি আমার বুকের কাছে উলঙ্গ হয়ে বসে মহা উৎফুল্লে আমার সকল অঙ্গ, সকল ইন্দ্রিয় পিশাচীর মতন কেটে কেটে নিয়েছ, নিয়ে অন্ধকারে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। এখন আর আমি নবীন নই। তুমি কি সুখী হয়েছ?

গত রাত্রের সেই স্বপ্নের মতন দেখলাম: সরসী আমার মুখচুম্বন ও অশ্রুপাত করতে করতে বলছে—'নবীন, আমি আজ বড় সুখী, বড় সুখী; তুই আমার লক্ষ্মী, তুই আমার সোনা, তুই আমার সর্বস্ব। তুই আমার কাছে কিছু চা, চেয়ে চেয়ে নে।'

এ তোমার কেমন সুখ, সরসী? এ তোর কোন সুখ? এই কী তোর সেই নবীন? তোর নবীন ছিল তোর চোখের মণি, রাজার দুলাল। আজ তোর নবীন রাস্তার কাদায় লুটোচ্ছে চাপা পড়া কুকুরের মতন।

সরসী যেন আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল: 'নবীন তোকে তখন দেখেছি—তোর সুখে; কতকাল ধরে দেখেছি। আজ দেখছি তোর দুঃখে।…তোকে আমি অর্ধেক করে দেখতে চাইনি, সম্পূর্ণ করে দেখতে চেয়েছিলাম। তুই আজ সম্পূর্ণ। এই দেখার জন্যে আমি এত বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি। তুই যে আমার সর্বস্ব।'

আমার চেতনা আবার মরে আসছিল। মরে আসতে আসতে শুনলাম—সরসী বলছে, 'তুই আমার কাছে কিছু চা, চেয়ে চেয়ে নে।'

কি আমি চাইব? অন্য কোনো হৃদয়? অন্য কোনো চক্ষু?… আমি কিছুই চাইতে পারছিলাম না। চেতনা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সরসীর মুখের ছায়া যেন আমার চোখের পাতার ওপর অন্ধকার বিছিয়ে দিল।

কী আশায়

সকালে ঘুম ভেঙে গেলে বিষ্ণু কয়েক মুহূর্ত কিছু অনুভব করল না ; তারপর সে তার মাথা, চোখমুখ, হাত-পায়ের সাড় পেল। কর-করে মোটা কম্বলের তলায় শরীর বেশ গরম মনে হলেও মাথার অবস্থা থেকে তার ধারণা হল, জ্বরটর হয়েছে। মাথা খুব ভার লাগছিল, যেন কাল সারা রাত ইঁটের ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল, আজ আর মাথা নাড়াবার সামর্থ্য নেই। বিষ্ণু চোখের পাতাও খুলল না। বাঁ চোখটা তেমন যন্ত্রণা দিচ্ছে না, কিন্তু ডান চোখের ভুরুর ওপর ফুলে আছে, হয়ত কালশিরে পড়ে আছে। চোয়ালে দাঁতে-টাতেও ব্যথা আছে। বাঁ হাতের কনুই, ঘাড় পিঠ এবং পায়েও ব্যথা-যন্ত্রণা ; আপাতত এই সব ব্যথা জায়গায় জায়গায় জমে রয়েছে যেন, বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলেই ছড়িয়ে পড়বে।

বিষ্ণু শুয়েই থাকল। শুয়ে শুয়েই সে এক থেকে দশের মধ্যে তিনটে সংখ্যা চট করে মনে করল : তিন, পাঁচ, নয়। সতেরো কিংবা তিনশো উনোষাট—কোনোটাই বিষ্ণুর মনোমত হল না। তার কপাল খারাপ বলছে। এখনও যদি এই চলে—একই রকম তা হলে মুশকিল।

এবার বাঁ চোখের পাতা খুলল বিষ্ণু, তারপর আস্তে আস্তে ডান পাতা। ডান চোখের পাতা ভাল করে খোলা গেল না। ভুরুর ওপর টনটন করছে। বিমর্ষভাবে বিষ্ণু নিজের মুখে একবার সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে নিল। না, অক্ষত নেই ; দু'এক জায়গায় কেটেকুটে আছে, একটু আধটু ফোলাও হাতে ঠেকছে ; আয়োডিনের গন্ধও তার নাকে লাগছে এখন। বিষ্ণু অসহায়ভাবে নিজের মাথার চুলেও অল্প হাত বোলাল। তার কি বেশ জ্বর হয়েছে ? না, অল্পস্বল্প ? ব্যথার

জন্যে বিষ্ণু কাল সন্ধ্যের পর থেকে দু' দুবার আর্নিকা মণ্ট খেয়েছে, কুসুমবাবু দিয়েছিলেন। তেমন একটা উপকার হয়েছে বলে বিষ্ণুর মনে হল না।

আরও একটু বিছানায় শুয়ে থেকে বিষ্ণু উঠল। শুয়ে থেকে লাভ নেই। শুয়ে থাকলে তার শরীর বা মনের কষ্ট যাবে না। হাত-মুখ ধুয়ে বিষ্ণুকে দেখতে হবে তার শরীরের অবস্থাটা ঠিক কতটা কাহিল হয়েছে। আর এটা কোনো রকমে সামলে নেবার চেষ্টা করতে হবে। কেন না সে এখনও, এই অবস্থাতেও সরে আসতে রাজী নয়।

খদ্দরের মোটা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে স্যাণ্ডেলে পা ঢোকাতে গিয়ে দেখল ওপরের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছে। এটা কালই হয়েছে। ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলিয়ে বিষ্ণু কিভাবে বাসায় ফিরেছিল তা আর মনে পড়ল না। হয়ত সে বুঝতেই পারে নি তার চটির এই হাল। ঘুঁষি চড় লাথির চোটে তার শরীরের এমনই অবস্থা, এতই অবসন্ন সে—যে নিজেকে মৃতপ্রায় লাগছিল; স্বাভাবিক হুঁশটুশ তার ছিল না। ওই অবস্থায় সে ফিরেছে। ফেরার পর কুসুমবাবুর মুখো-মুখি হতেই হইহই করে উঠলেন ভদ্রলোক। কুসুমবাবুর স্ত্রী—দিদি —জল গরম করে দিলেন। কোনো রকমে মুখটা পরিষ্কার হলে মহিলা কাটাছেঁড়া জায়গায় আয়ডিন লাগিয়ে দিলে কুসুমবাবু তার হোমিওপ্যাথি বাক্স থেকে দু' ডোজ আর্নিকা মণ্ট দিলেন। বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে এক পুরিয়া মুখে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। এসেই বিছানা। কিন্তু সে ঘুমোয় নি। আচ্ছন্নের মতন পড়ে ছিল। সামান্য রাত্রে কুসুমবাবুর স্ত্রী কিছুটা দুধ এনে দিলেন। বিষ্ণু দুধটা খেল, জল খেল, অর্নিকার পুরিয়া খেল। তারপর লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়ে ব্যথায় খানিকটা কাতরালো চাপা গলায়। শেষে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

স্ট্র্যাপ ছেঁড়া চটি কোনো রকমে ঘষড়াতে ঘষড়াতে বিষ্ণু বাইরে

এসে দেখল, রোদ ডালিমতলার এপারে চলে এসেছে, তার মানে বেশ বেলা হয়েছে। সামনের জমিটুকু শীতের রোদে ভরা। একপাশে কাঠের তক্তার ওপর পুকুরের জল বয়ে এনে বাউরী ঝি বাসনমাজা শেষ করে ফেলেছে। কুসুমবাবুর স্ত্রী সকালের বাসি কাপড়-চোপড় ছেড়ে কেচেকুচে শুকোতে দিয়েছেন, শাড়িটাড়ি ঝুলছে ওপাশে। কাঠকুটো, কাঁটা তার দিয়ে বাঁধা বেড়ার গায়ে বুনো লতাপাতা, কয়েকটা কলাফুলের ঝোপ। কিছু গাঁদা ফুটেছে এক কোণে, সন্ধ্যামণির ঝোপ হয়েছে। আর এই শীতে শিউলি গাছটা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিষ্ণু কয়েক পলক তাকিয়ে এইসব দেখল। ডান চোখটা সে পুরোপুরি খুলতে পারছে না, মাথাও বেশ ভার, হাত-পায়ে জড়তা—তবু বিষ্ণু চোখের সামনে নিত্যকার জিনিসগুলো দেখে যেন কিছুটা সান্ত্বনা পেল। না, তার মাথার গোলমাল, জ্বরবিকার কিংবা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয় নি। সে এখনও স্বাভাবিক। তার সঙ্গে যে লড়াই চলছে—সেই লড়াই তাকে এখন পর্যন্ত মেরে ফেলেনি। বিষ্ণু আরও কয়েক দফা লড়তে পারবে।

মুখ ধোওয়ার জলটল আলাদা করে তোলা ছিল—কুয়ার জল; বিষ্ণু মুখ ধুতে নীচে নেমে গেল।

রোদের মধ্যে দড়ির ছোট ছোট চৌকি পেতে দিয়ে কুসুমবাবুর স্ত্রী চা দিলেন। কুসুমবাবুর স্ত্রীর নাম প্রভা; প্রভাময়ী না প্রভাবতী বিষ্ণু জানে না। সে দিদি বলে। দিদি বলতে তার ভাল লাগে। কুসুমবাবু বলেন, আমি আজ বারো বছর শালাশালী শ্বশুরফশুরের কোনো ঝামেলা না রেখে জীবন কাটাচ্ছি, তুমি বিষ্টুচন্দর এই অবেলায় আবার কেন মায়া বাড়াতে আসছ! তবে হ্যাঁ, তুমি শুধু শালা নও স্বয়ং বিষ্ণু, তাড়াতে পারছি না। কুসুমবাবু অবশ্য কখনোও একথা বলেন না যে তাঁরা নিঃসন্তান, আত্মীয়স্বজনহীন—ফলে এক-আধজনকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করতে তাঁদের ঔৎসুক্য কম নয়।

বিষ্ণু দড়ির ছোট চৌকিতে বসে চা খাচ্ছিল, রোদের দিকে পিঠ ; প্রায় মুখোমুখি কুসুমবাবু বসে।

কুসুম বললেন, "বিষ্ণুচন্দ্র, তোমার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। কাল আমি তোমার দিদিকে বলেছি—এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না।"

বিষ্ণু চায়ের গরম ডান চোখের ফোলার ওপর দেবার চেষ্টা করতে করতে বাঁ চোখ দিয়ে কুসুমকে দেখল।

"তুমি একদিন নির্ঘাত মরেফরে আসবে" কুসুম বললেন, "জোর মারধোর খাচ্ছ, আজ হাঁটু, কাল কবজি, পরশু মাথা—একটা না একটা জখমই হচ্ছে, তবু তোমার চেতনা হচ্ছে না। এরপর তো গলা টিপে শেষ করে দেবে। কী ছেলেমানুষী করছ তুমি!"

বিষ্ণু কোনো জবাব দিল না, চুপচাপ। রোদের তাতে তার শরীরের জ্বর-ভাব বাড়ছিল না কমছিল সে বুঝতে পারছিল না। তার আরাম লাগছিল যদিও তবু ভেতরে কী রকম চাপা কাঁপুনি লাগছিল।

কুসুম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলেন, যেন বিষ্ণুর কাছ থেকে কী জবাব পান দেখতে চাইছিলেন। বিষ্ণু কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে বললেন, "কি হে, চুপ করে আছ কেন?"

বিষ্ণুর গলা এখনও পরিষ্কার নয়, সর্দি জড়িয়ে আছে। গলা পরিষ্কার করে বিষ্ণু একটা শব্দ করল. শব্দই যেন সার, কোনো জবাব নেই।

কুসুম অপেক্ষা করে থাকলেন।

শেষে বিষ্ণু বলল, "আমি পারছি না। ওর জোর বেশি।" বলে একটু থামল, আরও চাপা গলায় বলল, "ওর দলের ছেলেগুলোও কাছে থাকে।"

"সবই যদি বুঝছ তবে যাচ্ছ কেন?" কুসুম যেন খানিকটা অপ্রসন্ন।

বিষ্ণু প্রায় এক চোখেই কুসুমকে দেখছিল। এবার ডান চোখটাও বড় করার চেষ্টায় তার চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। বলল, "বাঃ! যাব না?" বলে একটু থামল, আবার বলল, "না গেলে আমি হেরে যাব।"

এই বোকা অদ্ভুত অবাধ্য ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুসুমের মনে হল জেদের বশে ছেলেটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে, নিজের ভাল মন্দ বোঝার ক্ষমতাও তার নেই। পাগল একেবারে।

কাছাকাছি কোথাও প্রভা এসেছিল কোনো কাজে। কুসুম ডাকলেন। "ঘর থেকে একটা আয়না এনে তোমার ভাইকে দেখাও। শালা আমার রবার্ট ব্রুস···।"

বিষ্ণুর চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুসুমের প্রতি এখন তার তেমন মনোযোগও নেই। বিষ্ণু ভাবছিল—এই জ্বরো ভাব, গায়ে হাতের ব্যথা কমাবার জন্যে তাকে কিছু করতে হবে। সে একবার রসোবাবুর ডাক্তারখানায় যাবে, সামন্ত কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে তার বেশ ভাবসাব হয়েছে। রসোবাবু তার এইরকম মূর্তি দেখলে নানান কথা জানতে চাইবেন। সামন্ত চাইবে না। সামন্ত কিছু কিছু জানে। সামন্তই তাকে দু' চারটে কড়া ট্যাবলেট দিতে পারবে, এই ফোলাটোলা, কাটাকুটি খানিকটা ধাতস্থ করে দিতেও পারবে হয়ত। বিষ্ণুর পক্ষে আজই সব সামলে নেওয়া সম্ভব নয়; কালকের চোট-জখম খানিকটা বেশি। কাল পরশুর মধ্যে অবশ্য বিষ্ণু আবার সামলে উঠে ওদের মুখোমুখি হতে চায়।

ততক্ষণে প্রভা একটা আয়না নিয়ে এসেছে।

কুসুম বললেন, "তোমার ভাইয়ের হাতে দাও, মুখটা দেখুক।"

প্রভা আয়না বাড়িয়ে দিল।

বিষ্ণু প্রথমে আয়না নিল না। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রভার চোখে চোখ পড়তে বিষ্ণুর মনে হল: এ-সব ব্যাপারে দিদিও যেন ক্ষুণ্ণ, বেশ উদ্বিগ্ন। দিদিকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

কী মনে করে বিষ্ণু হাত বাড়িয়ে আয়নাটা নিল। নিয়ে নিজের মুখ দেখল। প্রথমেই ডান চোখের ওপর নজর পড়ল। বিষ্ণু যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি, ভুরুর ওপর অনেকটা ফুলে গেছে, জামফলের মতন রঙ হয়েছে, সেই ফোলা যেন চোখের পাতায় ছড়িয়ে এসেছে। চোখের সাদা জমি—যেটুকু দেখা যাচ্ছে—লালচে মতন। চোখের তলাতেও সামান্য কালচে ভাব। গাল, থুতনি, কপালেও নানারকম কাটাছেঁড়া; আয়োডিনের দাগ খয়েরী হয়ে এসেছে। ঠোঁট ফুলে আছে একপাশে। নিজের মুখের এই অবস্থা দেখতে দেখতে বিষ্ণুর রাগ আক্রোশ হচ্ছিল, উত্তেজনায় তার জ্বরোভাব যেন আচমকা বেড়ে গিয়ে এক দমক কাঁপুনি এল।

প্রভা বলল, "কতটুকু ক্ষমতা তোমার! পাজী হতচ্ছাড়াগুলোর সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাও?"

বিষ্ণু আয়নাটা রেখে দিল। দিদি আজ রেগে রয়েছে। কাল কুসুমবাবুর সঙ্গে দিদির যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছে, বিষ্ণুকে নিয়ে আলোচনাও হয়েছে, বিষ্ণু তা বুঝতেই পারছে। নয়ত দিদি এত রেগে থাকত না। বিষ্ণুর জন্যে দিদিকে কী কী শুনতে হয়েছে কে জানে! কুসুমবাবু বরাবরই এই ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করছেন না।

কিছুই যেন বলার নেই, বিষ্ণু বাঁ হাতে একটু মাথা চুলকে কৈফিয়তের মতন করে বলল, "পান্নার আঙুলে লোহার ভারী আঙটি মতন ছিল, তাতেই লেগেছে।" বিষ্ণু এমনভাবে বলল কথাটা যেন, এই সব জখম বা এত বড় বড় চোট হবার কারণ পান্নার লোহার আঙটি। ওটা না থাকলে বিষ্ণু কিছুতেই এ রকম জখম হত না, আর ছোটখাটো চোট হলে নিশ্চয় বলারও কিছু থাকত না।

বিষ্ণুর কথা বলার ধরনে প্রভা চটে গেল। বলল, "তুমি সাত ন্যাকার এক ন্যাকা। বেশ তো, এর পর পান্নার হাতে লোহার কাটারি

থাকবে, তোমার মাথা দুখানা করে ছেড়ে দেবে আর তুমি এসে বলবে—পান্নার হাতে কাটারি ছিল।…কী ঝকমারি। স্কুলে কত বচ্ছর পড়ালে গাধা হয় শুনেছি, তুমি দেখছি তিন মাস না যেতে যেতেই গাধা হয়ে গিয়েছ।"

বিষ্ণু মুখ ফিরিয়ে গাঁদা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার খারাপ লাগছিল। কুসুমবাবুকে বিষ্ণু তেমন কিছু বলতে বা বোঝাতে চায় নি কোনদিন, কিন্তু দিদিকে ব্যাপারটা সে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বিষ্ণু জানত, এই সব ঝগড়া-ঝামেলা, মারামারি দিদির পছন্দ না হলেও অন্তত বিষ্ণুর বেলায়—বিষ্ণু যে কেন এইভাবে বার বার লড়তে যাচ্ছে—দিদি ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। আর পারছে বলেই উদ্বেগ ও বিরক্তি সত্ত্বেও দিদি বিষ্ণুর বিপক্ষে নয়। আজ দিদিকে অন্য রকম মনে হচ্ছে। বিষ্ণুর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

প্রভা আর দাঁড়াল না, চলে গেল। আয়নাটা পড়েই থাকল।

কুসুম বিষ্ণুর বিমর্ষ ক্ষুব্ধ অবস্থাটা দেখতে দেখতে এবার কৌতুক করে বললেন, "তোমার খুঁটিও নড়বড়ে হয়ে গেছে বিষ্টুচন্দ্র, এটা বিপদসংকেত। আমি বলি কী, মাথাটাথা ফাটিয়ে ফিরে আসার আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব খানিক। তুমি হলে শান্তশিষ্ট নরম ধাতের মানুষ, বাংলার মাস্টার, মাইকেল টাইকেল পড়াও বটে কিন্তু মেঘনাদ নও। তুমি এ সব গণ্ডগোলে থাকবে কেন? বদমাশ, ভ্যাগাবাণ্ড, লোফার ক'টা ছোঁড়ার সঙ্গে তোমার লড়ালড়ি ভাল নয়, উচিতও নয়। স্কুলের মাস্টার তুমি—তোমার এ রকম হাল দেখলে সবাই বলবে কী। এরই মধ্যে তো নানা রকম গুজব শুরু হয়ে গেছে। কার মুখ তুমি চাপা দেবে! মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব খানিক, অকারণে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ো না।"

এর পর কুসুম উঠে গেলেন। ঘরে কিছু কাগজপত্র পড়ে আছে।

স্কুলের কাজ। কুসুম অঙ্কের মাস্টার, তা ছাড়া স্কুলের সিনিয়ার টিচার বলে কিছু অফিসের কাজকর্মও করার থাকে।

বিষ্ণু আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। তার মাথা এত ভার, চোখের যন্ত্রণা এমনই যে কুসুমবাবুর কথাবার্তা সে যদিও শুনল তবু এ সব নিয়ে কিছু ভাবতে পারল না। শীতে কাঠ হয়ে থাকা শিউলিগাছটা বাতাসে নড়তে শুরু করল। বিষ্ণুরও চোখ যদিও অন্যমনস্ক তবু শিউলি গাছের চাঞ্চল্য দেখে সে আচমকা নিজের চাঞ্চল্য অনুভব করল। করে উঠে পড়ল।

সেদিন রবিবার। ছুটি। পরের দিন ক্লাস প্রমোসান। তারপর দিন পাঁচেক বড়দিনের ছুটি। বিষ্ণুর করার কিছু ছিল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিষ্ণু প্রথমে কাছাকাছি ডুমুরতলার মোড় থেকে পায়ের চটিটা সরিয়ে নিল। তারপর হাতের ময়লা রুমালে ডান চোখটা মাঝে মাঝে চেপে ধরে সোজা রসোবাবুর ডাক্তারখানায় চলে গেল। এ সময় রসোবাবু থাকেন না। সেদিন সামনেই বসে ছিলেন। বিষ্ণুর ইচ্ছে নয় রসোবাবুর মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক যে কোনো ব্যাপারেই পঞ্চাশ রকম প্রশ্ন করেন। বিষ্ণু এ সবের জবাব দিতে চায় না। অগত্যা বিষ্ণুকে কাছাকাছি জায়গায় ঘুরঘুর করে সময় কাটাতে হল রসোবাবু না-ওঠা পর্যন্ত। এরই মধ্যে বিষ্ণু দেখল রাস্তায় তাকে অনেকেই লক্ষ করছে, মুখচেনারা কাছে এসে প্রশ্নটশ্নও করল; বিষ্ণু এড়িয়ে যেতে লাগল: 'না, কিছু না—এমনি; পড়ে যাই নি ঠিক, ওই রকমই হয়েছিল; অন্ধকারে কী রকম একটা…' এই সব এলোমেলো কথা বলে বলে যখন আর পারছে না—তখন রসোবাবু ডাক্তারখানা ছেড়ে উঠে পড়লেন দেখে বিষ্ণু সেদিকে এগিয়ে গেল। রসোবাবু এবার চললেন 'কল'-এ।

বিষ্ণু ঠিক এই সময়ে তার হুজন ছাত্রকে দেখতে পেল। এই ভয় সে বরাবরই করছিল। ছাত্র দেখামাত্র বিষ্ণু খুব ঘাবড়ে গিয়ে রাস্তার কুকুরের ওপর দিয়ে লাফ্ মারল, মেরে সোজা রসোবাবুর ডাক্তারখানার পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

কম্পাউণ্ডার সামন্ত বোধ হয় কল্পনাও করে নি বিষ্ণুর এই রকম মূর্তি দেখতে হবে। সে ইদানীং বিষ্ণুকে মাঝেসাঝে তুলোটুলো ছুঁইয়ে দিচ্ছিল, দু'একটা বড়ি ফড়িও দিচ্ছিল। কিন্তু এবারে বেশ খানিকটা বাড়াবাড়ি। সামন্ত বলল, "অ্যাঃ হে ; মুখটা যে থেঁতো করে দিয়েছে মাস্টার মশাই। বড্ড মেরেছে।"

বিষ্ণুর আর সহ্য হচ্ছিল না। কোনো রকমে সে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। কালকের ঘটনা সম্পর্কে দু'চার কথা বলল বিষ্ণু। সামন্ত ততক্ষণে পরিষ্কার তুলো বের করে তার কাজ শুরু করেছে। রেকটিফায়েড স্পিরিট দিয়ে কাটাকাটিগুলো মুছিয়ে পাতলা করে মারকিওরোক্রম বুলিয়ে দিল। বলল, "চোখের ফোলাটা যেতে সময় লাগবে, সেঁক দেবেন আস্তে আস্তে। গায়ে একটু জ্বর এসেছে, দাঁড়ান কটা বড়ি দিচ্ছি।"

"ওই পান্না শালারা শয়তান" সামন্ত বলল, "বুঝলেন মাস্টার মশাই, হাড় হারামী। ওদের জব্দ করতে হলে শুধু হাতে লড়লে চলবে না। ছোরাছুরি চাই।" বলতে বলতে ক্রোধের বশে সামন্ত মলম-তৈরি-করা ছুরিটা হাতে তুলে বিষ্ণুর দিকে বাড়িয়ে ধরল। "একটা ছুরিটুরি সঙ্গে নেবেন। দেবেন শালার……"

"ছুরি ?" বিষ্ণু অবাক হয়ে বলল। "ছুরি কেন ?"

"না থাকলে একদিন আপনিই মরবেন।"

"না—" বিষ্ণু মাথা নাড়ল। "ছোরাছুরি নেবার কথা তো নেই। পান্নার কাছেও ছোরা থাকে না।"

সামন্ত সামান্য থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, "থাকে না আপনি জানলেন কি করে ? দরকারের সময় ঠিক বের করবে।"

বিষ্ণু মাথা নাড়ল। না, সে ছুরিটুরি নেবে না।

সামন্তর কাছ থেকে বিষ্ণু সোজাসুজি বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে গোটা দুই বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকল খানিক। তার বেশ শীত করছিল, মাথাও অবশ লাগছিল। শীতের বেলা বাড়তে বাড়তে প্রায় দুপুরের কাছাকাছি হয়ে এল যখন তখন বিষ্ণু ঘুমোচ্ছে। প্রভার ডাকাডাকিতে উঠল, স্নানটান করার কথাই ওঠে না, কিছু খেয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেল একটা। তারপর কী মনে করে তার ঘরের পেছন দিকে রোদে গিয়ে বসে থাকল। পৌষের রোদ এবার ভাঁটার দিকে, মাঠের ধুলো বাতাসে উড়ছে, খেজুর গাছের মাথা টপকে বালিয়াড়ির মতন উঁচু ঢিবিটা দেখা যাচ্ছিল, তার কাছাকাছি হাট বসেছে, হাটের কিছু কোলাহল ভেসে আসছে। দড়ির ছোট খাটিয়ায় শুয়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এইভাবেই দুপুর কাটল, বিকেল এল আর গেল। সন্ধ্যেবেলায় বিষ্ণু নিজের ঘরে। জামকাঠের ছোট মতন টেবিলটার ওপর লণ্ঠন জ্বলছে, পাশে একটা টিনের চেয়ার। সামান্য আগে প্রভা এসেছিল, কড়াইশুঁটি আর আলু সেদ্ধ করে গোলমরিচ দিয়ে সামান্য ভেজে এনেছিল, চা এনেছিল। বিষ্ণু খেয়েছে। প্রভা কিছুক্ষণ ঘরে বসে ছিল। সামান্য কথাবার্তাও হয়েছে। বিষ্ণুর মনে হয়েছে: দিদি সকালের মতন অতটা আর রেগে নেই, এখন যেন খানিকটা নরম হয়ে এসেছে। কুসুমবাবু বিকেলের আগেই বাইরে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি, ফিরতে রাত হবে।

সামন্তর ওষুধের গুণ বলতে হবে, সারা দিন পরে বিষ্ণুর এখন কিছুটা ভাল লাগছিল। বোধ হয় দুপুরে তার জ্বর এসেছিল,

জ্বরের ঘোরও ছিল, তার শারীরিক বেদনা ও কষ্ট ছাড়া সে আর কিছু অনুভব করতে পারে নি। প্রায় আচ্ছন্নের মতনই তার সারা বেলা কাটল। এবার, এই সন্ধ্যের দিকে যেন সেই বেহুঁশ ভাবটা কেটে গেছে অনেক। জ্বর আছে বলে মনে হচ্ছে না। গলার কাছে সামান্য ঘাম ফুটেছে, মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কম।

বিষ্ণু খানিকটা আগেই আরও দুটো বড়ি খেয়েছে ওষুধের। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে কম্বলের তলায় শুয়ে থাকল।

শুয়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু সমস্ত ব্যাপারটা আবার ভাবল, আগাগোড়া সব কিছুই, সে এখানে আসার পর যা যা ঘটেছে!

পুজোর আগে আগেই বিষ্ণু এখানে এসেছে। তারাপদ দত্ত— এখানকার স্কুলের বাংলার এক মাস্টার মশাই হুট করে চলে যাবার পর সেই চাকরিটা বিষ্ণু পেয়ে যায়। তারাপদ ছিল বিষ্ণুর বন্ধু, বছর খানেকের সিনিআর। তারাপদদা চিঠি দিয়েছিল: আমি কলেজে একটা কাজ পেয়েছি। তুমি যদি এখানে আসতে চাও আমার জায়গায় ঝটপট একটা অ্যাপ্লিকেসান পাঠাবে, আমি সাধ্যমত বলেকয়ে যাব; তারপর তোমার ভাগ্য।

বিষ্ণুর ভাগ্য ভাল; চাকরিটা তার হয়ে যায়। কুসুমবাবু কেন যেন তার হয়ে দু কথা বলেওছিলেন। এ ব্যাপরে তারাপদদার হাত থাকতে পারে, কিংবা বিষ্ণুকে দেখে কুসুমবাবুর হয়ত পছন্দও হয়েছিল। বিষ্ণু সঠিক কিছু জানে না, চাকরি জুটলেও তার থাকার জায়গা নিয়ে অসুবিধে ছিল। কুসুবাবু নিজের বাড়িতে বিষ্ণুকে জায়গা দিলেন।

দু এক মাস করে এদিক ওদিক মাস্টারী করলেও বিষ্ণু পুরোপুরি বা পাকাপাকিভাবে কোথাও চাকরি করতে পারে নি, পায় নি। এখানের চাকরিটা সেদিক থেকে স্থায়ী, বিষ্ণু কারও বদলি খাটতে আসে নি। চাকরিটা ভালই লেগেছিল বিষ্ণুর। এটা কোনো শহুরে স্কুল নয়, জায়গাটাও ঠিক শহর নয়। এক সময় জায়গাটা

নিশ্চয় পুরোপুরি গ্রাম ছিল—বড় গ্রাম; ক্রমে আর গ্রাম থাকে নি, যদিও গ্রামের পুরোনো গন্ধটা রয়ে গেছে। কাছাকাছি কয়েকটা কয়লাকুঠি চালু ছিল অনেক দিন ধরে, ইদানীং আরও ছড়িয়েছে, মস্ত ছুটো ফায়ার ক্লে কারখানা হয়েছে, আর একেবারে হালে গড়ে উঠছে কাঁচ কারখানা। এর কোনোটাই এই জায়গার মাঝমধ্যে বসে নেই, কিন্তু গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। ফলে এখন এই জায়গাটা গ্রাম নয়, শহরও নয়, দুয়ের মেশামিশিতে এক আধা-শহর।

বিষ্ণু জায়গাটা পছন্দ করে ফেলেছিল। স্কুলও তার ভাল লেগেছিল। তার বয়েস অল্প, অভিজ্ঞতাও প্রায় কিছুই নেই। বিষ্ণুর প্রথম প্রথম ভয় হয়েছিল সে হয়ত পড়াতে পারবে না। মাস খানেকের মধ্যে বিষ্ণুর সে ভয় কেটে গেল। পড়াতে তার আর কোনো অসুবিধেই হচ্ছিল না। বরং সে যত্ন করে মন দিয়ে পড়াতে পারছে বুঝে নিজেই বেশ খুশী হয়ে উঠছিল।

গণ্ডগোলটার সূত্রপাত তার পর থেকেই। বিষ্ণু যখন নিজেকে প্রায় সব দিক দিয়েই মানিয়ে নিয়েছে, সে খুশী হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছিল—এবার আর তার দুশ্চিন্তার উদ্বেগের কিছু নেই—তখনই এই ঝঞ্ঝাটটা শুরু হল, পান্নাদের সঙ্গে গণ্ডগোল।

বিষ্ণু এমন মানুষ নয় যে সে নিজে এরকম বিশ্রী একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াতে চাইবে। তার সেরকম চরিত্রও নয়। বরং বিষ্ণু এমন ধাতের ছেলে—যে কোনোরকম হামলা হুজ্জুত পছন্দ করে না। তার স্বভাব নরম, প্রকৃতি শান্তশিষ্ট। লোকে তাকে নিরীহ, লাজুক, নম্র বলেই বরাবর জেনে এসেছে। চেহারাও বিষ্ণুর এমন নয় যাতে তাকে তেমন সবল পুরুষ বলে মনে হতে পারে। তার গড়ন বরাবরই রোগা-ধরনের, খানিকটা ছিপছিপে। মাথায় সে মোটামুটি লম্বা। তার স্বাস্থ্য না চোখে-মুখে না হাতে পায়ে বুকে টগবগ করে ফুটছে বলে মনে হবে। তার গায়ের রঙ মামুলি, না কালো না বা ফরসা, ওই মাঝামাঝি। মুখ লম্বা ধরনের। নাকও

বেশ লম্বা, যদিও তার কপাল তেমন ছড়ানো নয়। হাত পা দেখে কোনোদিন কেউ সন্দেহমাত্র করবে না যে বিষ্ণু হাতাহাতি লাঠালাঠি করার যোগ্য। বরং বিষ্ণুর চোখ, বিষ্ণুর পাতলা ঠোঁট, সরু সরু আঙুল, সামান্য ঝুঁকে-পড়া পিঠ দেখে তাকে ভীরু দুর্বল অসহায় বলেই মনে হবে। ছেলেবেলায় ছোটরা যেরকম দৌরাত্ম্য সাধারণত করে থাকে—বিষ্ণু হয়ত ততটা করেছে, তার বেশি নয়। বড় হয়ে সে সাইকেল চড়া এবং ব্যাডমিন্টন খেলা ছাড়া আর কিছু শেখে নি। সে ফুটবল খেলা দেখেছে, নিজে বড় হবার পর খেলে নি কোনোদিন। কলেজে পড়ার সময় একবার বন্ধুরা তাকে হকি খেলতে নামিয়েছিল, বিষ্ণু যতবার স্টিক তুলে বল মারতে গেছে ততবার তার মনে হয়েছে সে বুঝি কোনো বন্ধুর মাথা, নাক কিংবা হাতে মেরে বসবে; ফলে বিষ্ণু স্টিক তুলতে সাহস পায় নি।

যদি বলতেই হয় তবে বলা ভাল, বেচারী বিষ্ণু এ-যাবৎ একেবারে গোবেচারার মতন জীবন কাটিয়েছে। বন্ধুরা তার স্বভাব দেখে ঠাট্টা করে বলত, তুই শালা মেয়েছেলে হয়ে জন্মালি না কেন? সোজা কথা যেসব পৌরুষ দেখে লোকে বাহবা দেয় সে-রকম পৌরুষ তার কোথাও ছিল না। সে কোনদিন জ্বলজ্বল করেনি লোকের মধ্যে, বরং মিটমিট করেছে। সে শখের গান গাইত, কবিতাটবিতা পড়ত, গুরু গল্প-উপন্যাস থেকে শুরু করে এলেরী কুইন-টুইন যা হাতে পেত পড়ে ফেলত। এক সময় তার প্লুরিসির মতন হয়েছিল সেই ভয়ে সে ঠাণ্ডায় ভয় পেত, জ্বরটর হলে মনমরা হয়ে পড়ত।

এই যে বিষ্ণু—নিরীহ, নরম, শান্তশিষ্ট, মিনমিনে, লাজুক এবং যে কোনো রকম উগ্রতাই যার অপছন্দ—সেই বিষ্ণু এখানে পান্নাদের মতন ছেলেদের সঙ্গে বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল।

সিগারেটটা ফুরিয়ে যাওয়ায় বিষ্ণু জানলার দিকে মাটির পিদ্দিমে—যেটা তার ছাইদান—নিবিয়ে ফেলে দিল। দিয়ে কম্বলের তলায় হাত ঢুকিয়ে নিল। নিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকল

কিছুক্ষণ, আবার চোখের পাতা খুলল, লণ্ঠনের আলো দেখতে দেখতে পান্নাদের সঙ্গে তার গোলমালের সূত্রপাতটা মনে করতে লাগল।

এখানে আসার মাস দুই পরে, বিষ্ণু যখন নিজেকে সব দিক দিয়ে মানিয়ে টানিয়ে নিতে পেরে খুশী হয়ে রয়েছে ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। একদিন সন্ধ্যের পর—সামান্য রাত করেই সে কেদারবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছিল সাইকেলে চড়ে। সাইকেলটা তার নয়, কুসুমবাবুর। কুসুমবাবু ইদানীং আর সাইকেল চড়তেন না, হাঁপানির জন্যে ছেড়েই দিয়েছিলেন। সাইকেলটা পড়েই ছিল; বিষ্ণু সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে চড়ছিল। পুরোপুরি শখ করেও সে চড়ছিল না। কেদারবাবুর বাড়িতে যাওয়ার জন্যেই সাইকেলটা তার দরকার হত। কেদারবাবুর বাড়ি খানিকটা দূরেই বরাকর নদীর কাছাকাছি। প্রিমিয়ার ফায়ার ক্লে-র বড়বাবু তিনি, টালি-বাংলোয় থাকেন। বিষ্ণু যেত কেদারবাবুর শালীর মেয়েকে পড়াতে। মেয়েটির নাম শচী। মা-বাবা নেই, মাসির কাছেই প্রতিপালিত হচ্ছে। শচীর বয়েস কমই, বছর আঠারো হবে হয়ত। শচীর চোখ-মুখ যেন পটে আঁকা, সুন্দর, লাবণ্য-ভরা; অথচ ভগবানের এমনই মার যে শচীর ডান পা অপুষ্ট। ছেলেবেলায় কী এক অসুখের পর থেকে এইরকম হয়ে গেছে। শচী তাই বরাবরই বাড়িতে পড়াশোনা করে। বিষ্ণুর প্রথম থেকেই শচীর ওপর মমতা পড়ে যায়। যথাসাধ্য যত্ন করেই বিষ্ণু তাকে পড়াচ্ছে।

সেদিন বিষ্ণু সাইকেলে করে ফিরছে, শীত পড়েছে প্রথম, চাঁদের আলোতে হিম জড়ানো; সামান্য উঁচু গলায় গান গাইতে গাইতে বিষ্ণু প্রায়-ফাঁকা রাস্তা ধরে আসছিল। এ-রকম গান—শখের গান বিষ্ণু গায়। সেদিন গানের কীরকম মনও পেয়ে গিয়েছিল বিষ্ণু। গোটা দুয়েক গান শেষ করে সে যখন 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়…' গাইতে গাইতে আসছে তখনও সে তার গায়ে ঘন করে জড়ানো শচীর দেওয়া মেয়েলী পাতলা চাদরটার জন্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ চুপ করে যাচ্ছিল।

এই চাদর শচী তাকে জোর করে দিয়েছে, বিষ্ণু নিতে রাজী হয় নি। বিষ্ণুর গায়ে নামমাত্র সোয়েটার, নতুন ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, ফাঁকায় ফিরতে হবে বলে শচী জবরদস্তি করেই দিয়ে দিয়েছিল।

ঈশ্বরীতলা ছাড়িয়ে চৌমুখো বাজারটার কাছে এসে বিষ্ণু ভেবেছিল, মুটুর চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে ডান হাতের পথটা ধরবে। তাতে সুবিধে হবে সামান্য। জায়গা মতন মোড় নেবার সময় বিষ্ণু দেখল, ওই ছোট্ট রাস্তায় জনা চার-পাঁচ জটলা করছে। বিষ্ণু চিনতে পারল—এখানকার কয়েকটা বকাটে বাজে ধরনের ছেলে, পান্নার দলবল। বিষ্ণু ততক্ষণে গান থামিয়ে দিয়েছে, এবং কিছুটা বিরক্ত হয়েই ওদের গায়ের পাশ দিয়ে সাইকেলটাকে কাটিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে টাল খেয়ে পড়তে পড়তে পা বাড়িয়ে সামলে নিল। বিষ্ণু বলতে যাচ্ছিল রাস্তা আটকে গল্প কেন একটু সরে দাঁড়ালে কী হয়?—কিন্তু তার আগেই একজন বিষ্ণুর সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল খপ্ করে।

বিষ্ণু রীতিমত অবাক হয়ে গেল। এমন নয় যে তার সাইকেল ওদের কারও গায়ে লেগেছে। বিষ্ণু মুখের দিকে তাকাল ছেলেটার। "সাইকেল ধরছ যে?"

ছেলেটা কোনো জবাবই দিল না, বরং এমন করে সাইকেলটা বিষ্ণুর দিকে জোরের সঙ্গে ঠেলে দিল যে বিষ্ণুর হাঁটুতে সাইকেলের চাকাটা লাগল। বিষ্ণু উঃ করে উঠল।

পান্না পাশের ছেলেটাকে সরিয়ে বিষ্ণুর মুখোমুখি দাঁড়াল। বিচিত্র মুখ করে দেখল, তারপর মুখ একটু নামিয়ে ঘাড় কাত করে এক চোখ প্রায় বুজে অন্য চোখ টেরা করে বলল, "আলো কই?"

বিষ্ণুর সাইকেলে অবশ্য আলো ছিল না। এখানে সাইকেলে আলোটালো কেউ রাখে না। নিতান্ত দায়ে পড়লে পকেট টর্চ জ্বালায়। বিষ্ণু বলল, "আলো নেই।"

"ঘন্টিও নেই নাকি—?"

ঘন্টি আছে, বিষ্ণু অবশ্য ঘন্টি মারেনি, কেননা সে একটু তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরেছিল এবং পান্নারা তাকে দেখছে দেখে অযথা আর ঘন্টি দেয়নি। বোধহয় বিষ্ণু খানিকটা অন্যমনস্কও ছিল।

বিষ্ণু বলল, "ঘন্টি মেরে কী হবে। সামনাসামনি দেখা যাচ্ছে···"

"দেখা যাচ্ছে—! তুমি শালা মটরের হেডলাইট নাকি?" পান্না বিশ্রী মুখ করে খিঁচিয়ে উঠল।

বিষ্ণু তুমি এবং শালা দুটো শব্দই স্পষ্ট শুনতে পেল। সে বুঝতে পারল পান্না ইচ্ছে করেই শব্দ দুটো বলেছে। বোধ হয় বিষ্ণু প্রথমে তার সাকরেদকে 'তুমি' বলেছিল বলেই। বা পান্নার এটা ধরনও হতে পারে। বিষ্ণুর রাগ হল। সে স্কুলের মাস্টার আর ওরা এখানকার হতচ্ছাড়া বকাটে বদ ছেলে।

বিষ্ণু বলল, "কথাবার্তাগুলো ভদ্রলোকের মতন বলাই ভাল।"

সঙ্গে সঙ্গে পান্না একটা পা বিষ্ণুর দিকে বাড়িয়ে তার পা মাড়িয়ে দিল। "মাস্টারী মারছ? তোমার স্কুলে আমরা পড়ি শালা?"

বিষ্ণুর পায়ে লেগেছিল, রাগও হচ্ছিল। কান গরম হয়ে উঠল। সাইকেলটা টেনে নেবার চেষ্টা করল হঠাৎ ঝটকা মেরে। এর ফলে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের একটা হাতল পান্নার গায়ে লাগল।

পান্না বিনা বাক্যব্যয়ে বিষ্ণুর হাত চেপে ধরে টান মারল, তারপর মুচড়ে ধরল। বিষ্ণু যন্ত্রণায় কাতরে উঠল, সাইকেলটা ততক্ষণে সে ছেড়ে দিয়েছে। পড়ে যাচ্ছিল সাইকেলটা, কে যেন —পান্নার দলের কেউ, পড়ন্ত সাইকেল ধরে ফেলল।

একজন বলল, "মাস্টারকে দশঘর নামতা পড়িয়ে দে পান্না···ও নামতা ভুলে গেছে···!"

আর একজন বলল, "শালার প্রাণে খুব ফুরতি, গান গাইতে গাইতে আসছিল—ওর ফুরতি লিক্ করে দে।"

বিষ্ণু পান্নার হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "রাস্তার মধ্যে গুণ্ডামি হচ্ছে? হাত ছাড়ো।"

বাঁ হাতের মোচড় আলগা করলেও হাত ছাড়ল না। বলল, "বদনচাঁদ! শালার শরীর তো মুরগীর মতন, তাতে আবার তড়পানি। মারব পাছায় লাথ, মুখ থুবড়ে পড়বি।"

বিষ্ণু তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পান্নাকে ঠেলা মারল। তাতে তার হাত আলগা হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বিষ্ণু দেখল পান্না বিষ্ণুর পায়ের পাশে পা রেখে ঠেলে দিয়েছে। বিষ্ণু রাস্তায় উলটে পড়ল।

ধুলোর ওপর কয়েক মুহূর্ত পড়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু শুনল তার দলবলের সবাই হাসছে। অট্টহাস্য। কে একজন ব্যাঙ ডাকার আওয়াজ করল। চোখ মুখে হল্‌কা বেরোচ্ছিল বিষ্ণুর। সে উঠে দাঁড়াল।

বিষ্ণু উঠে দাঁড়াবার সময় তার গায়ের চাদরটা মাটিতে লুটোচ্ছিল। বিষ্ণু তুলে নেবার আগেই পান্নার দলের একজন সেটা কুড়িয়ে নিল। নিয়ে বিষ্ণুর নাকের ওপর ধুলো ঝাড়তে লাগল।

বিষ্ণু বলল, "আমার চাদর, সাইকেল দাও—"

"না", পান্না মাথা নাড়ল।

"কেন?"

"খুশি।"

"আমার জিনিস আমায় দেবে না?" বিষ্ণু প্রায় চেঁচিয়ে বলল।

"না, না—" পান্না যেন একই কথা বার বার বলতে হচ্ছে বলে বিরক্ত হয়ে শেষের 'না'-টা গলা ফাটিয়ে বিষ্ণুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, বলে মুখটা বিদ্রূপবশে হাঁ করে থাকল একটু। তারপর বলল, "নটবর নিমাই শালা। তুমি কিছু পাবে না।"

রাস্তায় পড়ে গিয়ে বিষ্ণুর লেগেছিল, রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। বিষ্ণু চিৎকার করে বলল, "গায়ের জোর?"

"হ্যাঁ, জোর—। মুরোদ থাকে নিজের জিনিস নিয়ে যাও।"

বিষ্ণু নতুন করে চারপাশ দেখল। তাকে চারপাশে ঘিরে চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে। পান্নার চেহারাটা প্রায় জন্তুর মতন

না হলেও তাকে ওই রকম দেখাচ্ছে। মাথায় মাঝারী, চৌকস গড়ন, হাত পা মুখ শক্ত, পরনে প্যান্ট, গায়ে পুরো হাতা লাল পুলওভার। মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা। বিষ্ণু বেশ বুঝতে পারল এই দলের হাত থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া তার সাধ্য নয়। নিজের অক্ষমতা এবং অসহায়তা তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল যেন। ছি ছি, ছি ছি। চোখ দুটো সামান্য ঝাপসা হয়ে এল। বিষ্ণু এবার মাস্টারীর ঢঙে বলল, "তোমরা দল বেঁধে একজনের ওপর হামলা করে বীরত্ব ফলাচ্ছ? কাওয়ার্ড কোথাকার—!"

পান্না যেন কথাটা শুনল একটু। তারপর হো হো করে হেসে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে একজনকে বলল, "লে রে ফেলু, মাস্টার জ্ঞান দিচ্ছে—" বলে ফেলুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিষ্ণুর দিকে মজার মুখ করে তাকাল। তারপর আরও বিশ্রী ঢঙ করে বিষ্ণুর থুতনি ধরে নেড়ে এক বিঘত দূর থেকে একটা চুমু খাবার শব্দ করল। "আয় হায় মাস্টার, তোমায় শালা কী বলব, জ্ঞানচাঁদ না জ্ঞানচৈতন্য। ...শোনো হে বদনচাঁদ, আমার দল তোমায় কিছু করেনি—করলে দাঁড়িয়ে বুলি মারতে হত না। বেশ, এরা কেউ কিছু করবে না— তুমি সাইকেল আর চাদর নিয়ে যাও যদি মুরোদ থাকে। আমি একলা থাকব, লড়ো শালা—কাম অন্..."

বিষ্ণু পান্নাকে দেখতে লাগল।

পান্না দু পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ মুখে শয়তানীর হাসি। ভঙ্গিটা হিংস্র।

বিষ্ণু দাঁড়িয়ে থাকল।

পান্না বলল, "আ যাও পিয়ারী...আ যাও...। মরদ কা বাত হাতি কো দাঁত। তোমায় কেউ কিছু বলবে না, তুমি আর আমি ফাইট করব। জিতলে তুমি শালা তোমার জিনিস নিয়ে যাবে। মা কালীর দিব্যি!"

বিষ্ণু বুঝতে পারল, পান্না তাকে চ্যালেঞ্জ করছে। সে পারবে

না। কিন্তু…? বিষ্ণু পা বাড়িয়ে বলল, "সাইকেল আমার নয়, চাদরটাও পরের—। অন্যের জিনিস আমায় ফেরত দিতে হবে।"

পান্না এবার একটা খারাপ গালাগাল দিল।

বিষ্ণু যেন ছুটেই যাচ্ছিল, তার আগেই পাশে সরে গিয়ে বিষ্ণুর পায়ে ল্যাঙ মারল পান্না, বিষ্ণু মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াতেই পেছনে একটা লাথি মারল পান্না।

আর সম্ভব নয়। বিষ্ণু কোনো রকমে উঠে দাঁড়াল। ক্ষোভে, আক্রোশে, যন্ত্রণায় তার কান্না আসছিল। "তোমরা আমার জিনিস আমায় দেবে না?"

"না, ক্ষমতা থাকে লড়ে নিয়ে যাও।"

বিষ্ণু নীরব।

পান্না কী ভেবে বলল, "এগুলো আমাদের জিম্মায় থাকল। আমাদের ক্লাবঘরে থাকবে। ওই বাড়িটায়—" বলে পান্না আঙুল দিয়ে সামান্য তফাতে একটা চালা মতন ঘর দেখাল। "ইয়ং বেঙ্গল ক্লাব। বুঝলে হে বদনচাঁদ!"

বিষ্ণু বুঝল কী না কে জানে—সে এবার পা বাড়াল, পরাজিতের মতন।

পান্না বলল, "তুমি লোকজন ডেকে সাইকেল চাদর নিয়ে যেতে এলে তোমায় আর এখানে ঘাড়ে মাথা নিয়ে থাকতে হবে না মাস্টার, হুঁশিয়ার থেকো। শালা ভদ্রলোকের কথা। মরদ কা বাত। একলা আসবে, লড়ে যাবে, ক্ষমতা থাকে তো নিয়ে যাবে…"

বিষ্ণু চলেই যাচ্ছিল। তবু দাঁড়াল। বলল, "বেশ…কিন্তু অন্যের জিনিস, আমার বলার মুখ থাকল না।"

"তা হলে শালা প্রথমেই রোয়াবি করতে এলে কেন? হাত জোড় করে মাফি চাইলেই পারতে, মাপ করে দিতাম।…রোয়াবি যখন মেরেছ—তখন তুমি ভুগবে শালা, আমাদের কী!"

বিষ্ণু আর দাঁড়াল না। চলে এল।

এই ঘটনা বিষ্ণুকে তারপর থেকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছে। সাইকেলটা কুসুমবাবুর, চাদরটা শচীর। সাইকেলের ব্যাপারে কুসুমবাবুকে বিষ্ণু কিছুই বলেনি, তিনি জানতেও চাননি। কথাটা অবশ্য দিদি—অর্থাৎ প্রভাকে বিষ্ণু বলেছে। সাইকেলের জন্যে প্রভার তেমন দুশ্চিন্তা নেই, চিন্তা বিষ্ণুর জন্যে। বিষ্ণু জানে না, দিদি কুসুমবাবুকে আড়ালে সাইকেলের ব্যাপার বলেছে কিনা। কুসুমবাবু তো ও বিষয়ে চুপচাপ। শচীর চাদর নিয়েও বিষ্ণু খুব বিব্রত ও লজ্জিত। শচী প্রথম দিকে একবার অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেসও করেছিল ; বিষ্ণু কী বলবে বুঝতে না পেরে মিথ্যে কথা বলেছিল : "—পাছে গোলমাল হয়ে যায়—হারিয়ে টারিয়ে যায় ভেবে স্যুটকেসে রেখে দিয়েছিলাম সেদিনই। এমনই মুশকিল, স্যুটকেসের চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না। নিয়ে আসব একদিন।" শচী জবাব শুনে মুখ নীচু করে ফেলেছিল, আর ও প্রসঙ্গ তোলেনি।

আজ প্রায় একমাস হতে চলল ব্যাপারটা ঘটেছে। এর মধ্যে আরও ঝঞ্ঝাট গেছে। স্কুলের পরীক্ষা, খাতা দেখা। বিষ্ণুর মন যদিও ওই পান্নাদের দিকে পড়ে তবু তাকে কাজকর্ম করতে হয়েছে। কেদারবাবুর বাড়িতে আট-দশ দিন যেতেও পারেনি—পরীক্ষার কৈফিয়ত দিয়ে কাটিয়েছে। এখন তার স্কুল, পরীক্ষা, খাতা দেখা কিছুই নেই। সে এখন ওই একটা ব্যাপার নিয়েই উদ্‌ভ্রান্ত।

পান্নাদের কাছে বিষ্ণু আরও বার পাঁচ ছয় গিয়েছে। পান্না ভদ্রবাড়ির ছেলে, কিছুটা লেখাপড়াও শিখেছিল, একেবারে ছেলেমানুষ নয়—বিষ্ণুর প্রায় সমবয়সী। বিষ্ণু ভাবত, পান্না হয়ত শেষ পর্যন্ত তার অন্যায় বুঝতে পেরে—বিষ্ণুর জিনিস বিষ্ণুকে ফেরত দিয়ে দেবে। অথচ পান্নার মতিগতি বিন্দুমাত্র সেরকম নয়। যতবারই বিষ্ণু পান্নার কাছে গিয়েছে ততবারই সেই একই রকম—নোঙরা কথাবার্তা, তামাশা, বিদ্রূপ, মারধোর। বিষ্ণু প্রতিবারই মার খেয়েছে : পান্না তাকে নির্দয়ভাবে চড়, ঘুঁষি, লাথি

মেরেছে, হাত মচকে দিয়েছে, কব্জি জখম করেছে, পায়ে চোট দিয়েছে। পরাজিত, বিক্ষত, ক্লান্ত, অসহায় চেহারা নিয়ে প্রতিবারই ফিরে এসেছে বিষ্ণু। সে তার জিনিস উদ্ধার করতে পারেনি।

প্রথম থেকেই বিষ্ণুর কী মনে হয়েছিল কে জানে সে পান্নাকে তার প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিয়েছিল। এরকম প্রতিপক্ষের মুখোমুখি বিষ্ণু আগে কখনো হয়নি। বিষ্ণুর জেদ ধরে গিয়েছিল। আর ক্রমশই বিষ্ণু এক ধরনের হঠকারিতা বা পাগলামীর দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। অবশ্য বিষ্ণু একে পাগলামী বলত না, দিদি বলত, কুসুমবাবু বলতেন।

কিন্তু তা নয়। এটা পাগলামী নয়। ওই যে পান্নারা—দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়; পাজী হতচ্ছাড়া বদমাশ ছেলের দল: ওরা সত্যি সত্যি কী? এরা আর যাই হোক, বিষ্ণু বুঝতে পেরেছে, তার প্রতিপক্ষ। গায়ের জোর ছাড়া অন্য কিছু এরা বোঝে না। শরীরে ক্ষমতাটাই এদের অহঙ্কার। এই অহঙ্কারবশে তারা মনে করে না, অকারণে মানুষকে পীড়ন করা অন্যায়। নির্দয়, নিষ্ঠুর, ইতর হতে কিংবা পীড়ন, অপমান, অসম্মান করতে এদের বাধে না; বরং এসব করতে পারলে তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বিষ্ণুর সঙ্গে ওরা প্রথম থেকেই এরকম ব্যবহার করছে। আজকাল আরও বাড়াবাড়ি শুরু করেছে—পথেঘাটে তারা বিষ্ণুকে টিটকিরি মারে, রগড় করে কথা বলে, খুঁচিয়ে অপমান করার চেষ্টা করে। বিষ্ণুর সাইকেলটা যে তাদের এক্তিয়ারেই রয়ে গেছে এখনও, এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে মাঝে মাঝে পান্নাদের 'ইয়ং বেঙ্গল ক্লাবে'র চালাঘরের কাঁচা বারান্দায় সাইকেলটা বের করে রেখে দেয়। রাখেও কিম্ভূতভাবে চাকা দুটো আকাশের দিকে তুলে উলটে, এঁকিয়ে বেঁকিয়ে। সেই সঙ্গে শচীর চাদরটাকে পতাকার মতন করে একটা চাকার সঙ্গে বেঁধে দেয়। বিষ্ণুর চোখে পড়ার জন্যেই এই সমস্ত করে। দেখলে মনে হয় বিষ্ণুকেই যেন ওরা চিৎপাত করে মাটিতে

ফেলে দিয়েছে; ঠ্যাঙ তুলে, কোমর ভেঙে, হাত-পা দুমড়ে বিষ্ণু পড়ে আছে। সেই সঙ্গে শচীর চাদর তার গলায় লটকে রয়েছে।

এই নোঙরামি, ইতরতা দেখলে বিষ্ণুর অসহ্য রাগ হয়, আক্রোশ হয়, অপমানে চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কিছুই করতে পারে না। পান্নারা যখন তাদের ক্লাবের বারান্দায় বসে সিটি মারে, কিংবা জঘন্য ভাবে সকলে মিলে তালি ঠোকে, অশ্রাব্য কথাবার্তা ছুঁড়ে মারে—তখন বিষ্ণু মুখ নীচু করে চলে আসে। করার মতন তার কিছুই থাকে না।

যতই পান্নারা বাড়াবাড়ি শুরু করল ততই বিষ্ণুরও কেমন একরোখা ভাব বাড়তে লাগল। এখন সে ধরে নিয়েছে—পান্নার সঙ্গে তার লড়াইটা সম্মানের। পান্না জানে না, কিন্তু বিষ্ণু অনুভব করছে, বিষ্ণু যদি নিজের জিনিস ফিরিয়ে আনতে না পারে তবে বিষ্ণু বড় রকম মার খেয়ে যাবে। এ মার তার মনের: বিষ্ণু নিজের মর্যাদা, আত্মসম্মান, অধিকারবোধ হারিয়ে ফেলবে। বিষ্ণু এত সহজে হার স্বীকার করতে চায় না। সে যতবার তার জিনিস ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে ততবারই মার খাচ্ছে। তবু বিষ্ণু এখনও তেমন মার খায়নি যাতে সে বাস্তবিকই পান্নার কাছে হার স্বীকার করে নেবে। বিষ্ণু লড়বে, যতদিন পারে, যতটা পারে—! তারপর দেখা যাক শেষে কী দাঁড়ায়!

কম্বলের তলায় বিষ্ণু আরও খানিকটা উসখুস করল। সামন্তর ওষুধ বোধ হয় খুব কড়া, শরীরটা আনচান করছে, জল তেষ্টা পাচ্ছে বিষ্ণুর। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না, অথচ গলা শুকিয়ে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু উঠল। জলটল খেয়ে সামান্য পরে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বিষ্ণু নিজের মনেই মাথা নেড়ে বার কয়েক 'না—না' বলল। না, দিদি যা বলে তা সে হতে দিতে পারে না। কুসুমবাবুকে বলে বা পাড়ার এবং স্কুলের লোকদের বলে

সে পান্নার কাছ থেকে তার জিনিস উদ্ধার করে আনতে চায় না। অন্যের সামর্থ্যে বিষ্ণু নিশ্চয় তার সাইকেল বা চাদর নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তাতে বিষ্ণুর কোন গৌরব নেই। তাছাড়া পান্নার সঙ্গে তার লড়াই তাদের দুজনের, অন্যের নয়; বিষ্ণু একাই লড়তে চায়। পান্নাও এখন পর্যন্ত কথার খেলাপ করেনি। একাই লড়ছে। বিষ্ণুও করবে না।

দিন চারেকের মধ্যেই একরকম সুস্থ হয়ে উঠল বিষ্ণু। এই কদিন তার মাথায় পান্না ভর করে থাকল সর্বক্ষণ। সে ক্রমাগত মার খেয়ে যেতে পারে না, তাকে যে কোনো রকমে একবার অন্তত জিততে হবে। বিষ্ণু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবল, পান্না তাকে কীভাবে, কখন, কোন সুযোগে প্রথম চোট মারে। কীভাবেই বা সে অত তাড়াতাড়ি বিষ্ণুকে জখম করে দেয়। পান্নার জোর বেশি। অনেক বেশি। তার হাত পা লোহার মতন শক্ত; সে নানারকম কৌশল জানে; মানুষ মারায় সে অভ্যস্ত। বিষ্ণু কোনো কিছুই জানে না। এমন কি বিষ্ণু তেমনভাবে একটা ঘুঁষি ছুঁড়তেও পারে না।

তবু বিষ্ণু মনে মনে নানারকম ভেবে নিল। স্থির করল, এবার সে যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, কিংবা তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সে মরমর হচ্ছে ততক্ষণ সে পান্নার সঙ্গে লড়বে।

সেদিন সন্ধ্যের মুখে বিষ্ণু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রভা দেখতে পেয়েছিল। শুধলো, 'কোথায় যাচ্ছ?' বিষ্ণু বলল, 'আসছি ঘুরে।' বলে সে আর অপেক্ষা করল না, উঠোন দিয়ে নেমে গেল।

বাজারের দিকে সরাসরি বিষ্ণু গেল না, ফাঁকা দিয়ে যেতে

লাগল। সে প্রথম থেকেই উত্তেজিত হতে চাইছিল না, বরং মাথা ঠাণ্ডা করে হাঁটবার চেষ্টা করছিল; যেন প্রথম থেকে উত্তেজিত হবার অর্থ তার সামান্য যা শক্তি তা ফুরিয়ে ফেলা, নষ্ট করা। বিষ্ণু তার যতটুকু শক্তি ততটুকু অটুট রাখতে চায়। রাস্তায় যেতে যেতে বিষ্ণু বরং নিজেকে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল, মনে মনে বলছিল: হাজার হোক, বিষ্ণু তুমি তোমার মর্যাদার জন্যে লড়তে যাচ্ছ, তোমার জিনিস ফেরত আনতে—এবারও যদি না পার, আবার যাবে, আবার, যতদিন না হাত পা ভেঙে ঠুঁটো হচ্ছ…। কথাগুলো বিষ্ণুকে কীরকম যেন উদ্বেল করছিল, ভরসা দিচ্ছিল।

পান্নাদের ক্লাবের কাছে গিয়ে বিষ্ণু দেখল, চালাঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পান্নারা হুল্লোড় করে তাস খেলছে, বিড়ি সিগারেট ফুঁকছে। বিষ্ণু সরাসরি বারান্দায় উঠে গেল। উঠে ছোট দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

পান্নারা প্রথমে খেয়াল করেনি। পরে চোখ পড়তে কে যেন অবাক হয়ে বলল, "আরে, বিস্টু ম্যাস্টোর…!"

পান্নারা মুখ তুলে তাকাল। হাতের তাস হাতে। ঘরের একপাশে বিষ্ণুর সাইকেল দাঁড় করানো আছে, শচীর চাদরটা পান্না মাফলারের মতন করে গলায় জড়িয়ে নিয়েছে।

পান্না বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি শালা আবার এসেছ! না মাইরি, লজ্জাটজ্জা নেই তোমার। কুত্তার মতন। ঝাড়-ফুঁক গায়ে লাগছে না তোমার।"

বিষ্ণু কোনো কথা বলল না।

একজন তার হাতের সিগারেটটা পান্নাকে দিল। পান্না সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ছাইটা আঙুলে করে পরিষ্কার করে নিয়ে বেঁকা চোখে বিষ্ণুকে দেখল। "আমরা তাস খেলছি, ভেগে পড়ো।"

বিষ্ণু বলল, "আমার সাইকেল, চাদর—"

"নেহি মিলেগা।"

"আমার জিনিস আমি নেব।"

"না—" পান্না মাথা নাড়ল। তারপর কী মনে করে বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, "তোমার শালা মুরোদ নেই। তুমি পারবে না। তোমার কলজেয় হবে না। এ জন্মে নয়। তার চেয়ে তুমি আমাদের..." বলে পান্না একটা অশ্লীল কথা বলল।

বিষ্ণুর মাথা গরম হয়ে উঠল। "জানোয়ার কোথাকার। লোচ্চা...।"

পান্না আর বসে থাকল না, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে উঠে দাঁড়াবার সময় তার পা লেগে হ্যারিকেনটা উলটে গিয়ে দপদপ করছিল।

পান্না দাঁত পিষে বলল, "বাইরে চলো শালা, আজ তোমার জিব ছিঁড়ে নেব।"

বিষ্ণু চৌকাটি থেকে সরে এসেছিল। বারান্দার একেবারে ধারে সে। পাশে মস্ত এক জবা গাছের ঝোপ। বারান্দার সামনে খানিকটা মেঠো জমি, ওপাশে বকুল গাছ।

পান্না খেপা মোষের মতন বারান্দা থেকে লাফ মেরে মাঠে নামল। তার মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। পান্না হাত উঁচিয়ে বিশ্রীভাবে চিৎকার করে ডাকল, "চলে আয় শালা, বাপের বেটা হোস তো চলে আয়। আজ তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব তবে শালা আমার নাম।" বলতে বলতে গলায় জড়ানো শচীর চাদর সে টান মেরে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল।

বিষ্ণু বারান্দায় পান্নার সাকরেদদের পায়ের শব্দ ও কথা শুনতে পেল। মাঠে নেমে পড়ল বিষ্ণু। উত্তেজনায় তার পা কাঁপছে, চোখ মাথা গরম—আগুনের তাপ ছুটছে। তার প্রায় সামনাসামনি, পান্না দু হাত তুলে মত্তের মতন দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলোয় তাকে প্রবল, ভয়ংকর ও ভীষণ হিংস্র দেখাচ্ছিল। পান্না যে কী বলছে বিষ্ণু কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না, তার দু চোখ শুধু পান্নার দিকে। বিষ্ণু চোয়াল শক্ত করে আবার বলল, "জানোয়ার"...।

পান্না মাথার ওপর থেকে হাত নামিয়ে বোধহয় ঘুঁষি পাকিয়ে ছুটে আসছিল, বিষ্ণু তাড়াতাড়ি সরে যাবার চেষ্টা করেও পারল না, পান্নার ঘুঁষি তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে বাতাসে পড়ল। আর ঠিক তখনই, কোনো উপায় না পেয়ে বা আচমকা কী মনে হওয়ায় বিষ্ণু তার পুরো মাথাটা প্রাণপণে পান্নার মুখের তলায় মারল। একেবারে গুঁতো মারার মতন। পান্নার লাগল। কোথায় লাগল কে জানে—পান্না কাতরে উঠল। তারপরই সে সামলে নিয়ে বিষ্ণুর গলার কাছটা ধরে ফেলল। বিষ্ণু কিছু না বুঝেই পান্নার কুঁচকিতে জোরে একটা লাথি মারল। বিষ্ণুর গলা ছেড়ে দিয়ে পান্না পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে টলতে লাগল।

তারপর বিষ্ণুর আর কিছুমাত্র খেয়াল নেই। পান্না পাগলের মতন লাথি চড় ঘুঁষি চালাচ্ছে—অথচ সেগুলো যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, তেমন জোরও নেই। প্রথম চোটে জখম হয়ে গিয়ে হয়ত পান্নার হাত পা তেমন কাজ করছে না। বিষ্ণু তার মাথা দিয়ে আরও দুবার পান্নার বুকে মারল। শেষে জাপটাজাপটি করে এলোপাথাড়ি মার চলছে। চলতে চলতে বিষ্ণু জানে না, কখন সে হঠাৎ নীচু হয়ে গিয়ে পান্নার পেটে মেরেছে। মারটা বেকায়দা হয়েছিল। পান্না পেটে হাত দিয়ে টলতে টলতে মাটিতে বসে পড়ল। পান্নার দলবল চেঁচাচ্ছে। পান্না নিজেও গালাগাল দিতে দিতে আবার উঠে দাঁড়াল। সোজা হয়ে দাঁড়াবার পুরো ক্ষমতাও তার নেই! আর বিষ্ণুও এই সময় তার এত দিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ, তিক্ততা যেন চরিতার্থ করার জন্যে উন্মাদ হয়ে গেল। হিংস্রের মতন, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতন বিষ্ণু এবার সটান একটা লাথি মারল পান্নার মুখে। আর্তনাদ করে পান্না আবার মাটিতে বসে পড়ল। বিষ্ণু ছাড়ল না, ছুটে এসে আবার মারল। পান্না মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এই সময় কে যেন কী ছুঁড়ে দিল পান্নার দিকে। পান্নার কাছ

থেকে খানিকটা তফাতে এসে পড়ল জিনিসটা। বিষ্ণু দেখল, ছোরা। ছোরাটা ঘাসের ওপর পড়ে আছে, একেবারে শচীর চাদরের কাছে। পান্না হাত বাড়িয়ে নেবার অনেক আগেই বিষ্ণু ওটা নিয়ে নিতে পারে। বিষ্ণু কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

পান্নার দলের ছেলেগুলো একেবারে চুপ। খানিকটা আগেও চেঁচাচ্ছিল, এবার থেমে গেছে। হঠাতই। বিষ্ণু ছোরাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সব চুপ।

পান্না আর উঠছে না। আশে পাশে লোকজনের গলাও পাওয়া গেল।

লুটিয়ে পড়া পান্নার সামনে বিজয়ীর মতন দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল বিষ্ণু। এবার আশ্চর্য এক আনন্দ পেল সে। এতদিন সে শুধু মার খেয়েছে, পীড়ন সয়েছে, অপমানিত হয়েছে, আত্মসম্মান নষ্ট করে গেছে। আজ বিষ্ণু জিতেছে। এখন সে তার জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যেন পান্নার কাছে তার মর্যাদা এতকাল বাঁধা পড়েছিল—এইমাত্র বিষ্ণু তা ছাড়িয়ে নিতে পারল। বিষ্ণুর গলার কাছে কোনো আবেগ, উচ্ছ্বাস আটকে ব্যথা ব্যথা করল।

"আমি জিতেছি—তোমরা দেখো; দেখে যাও—!" বিষ্ণু যেন এই কথাটা চেঁচিয়ে বলতে গিয়ে সামনে তাকাল। তারপর আশেপাশে। পান্নার বন্ধুরা আস্তে আস্তে মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, পালাচ্ছে। এই তোমরা কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও, কাছে এসো, দেখে যাও—তোমাদের পান্না মাটিতে পড়ে লুটোচ্ছে, সে হেরেছে—আমি শেষ পর্যন্ত জিতেছি।

আশ্চর্য, মাঠ ফাঁকা; কেউ নেই; বিষ্ণুর জিত দেখার জন্যে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। খারাপ লাগল বিষ্ণুর, হতাশা বোধ করছিল।

শেষে বিষ্ণুর ভয় হল—পান্না কী মরে গেল নাকি? কোনো সাড় নেই। উঠছে না, কাতরাচ্ছে না।

বিষ্ণু ধীরে ধীরে পান্নার মাথার কাছে বসল। ইস্ পান্নার নাকের

তলায় রক্ত, গালে রক্ত, চোখ বোজা, চিবুক ফুলে গেছে, ধুলো লেগেছে তার কপালে, কানে। হাত ছড়িয়ে পান্না পড়ে আছে। না সে মরে নি, তার নিশ্বাস রয়েছে।

পান্নার লুটোনো, অচেতন, বিধ্বস্ত চেহারা দেখতে দেখতে একেবারে আচমকাই বিষ্ণুর কেমন মায়া হল। ও আর উঠতে পারছে না, ওর কোনো সাড় নেই। পান্না পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে যেন মাটিতেই পড়ে গেছে বরাবরের মতন।

আর এই সময় সহসা বিষ্ণুর চোখে জল এল। পান্নাকে সে যেন বলতে চাইল: তুমি ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়। লড়ো। লড়ে যাও। আমি শালা বিষ্ণু—বার বার তোমার লাথি খেয়েছি, কিল, চড়, ঘুঁষি—কী না, কিন্তু লুটিয়ে পড়ি নি, আবার এসেছি আমার জিনিস ফেরত নিতে। কিন্তু তুমি যখনই পড়লে আর উঠতে পারছ না। তোমার সে ক্ষমতা নেই কেন? কেন?

বিষ্ণু হাত বাড়িয়ে পান্নাকে নাড়া দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল। তার কেন যেন চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সে বুঝতেই পারছিল না কী আশায় সে এতদিন ধরে লড়ছিল আর কেনই বা আজ জিতেও তার এই অদ্ভুত বেদনা জাগল!

আমি

আজ সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ধোয়ার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। কুলকুচো করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, আমার ডান হাতের তালুর ওপর টলটলে জলের মধ্যে কালো মতন কি-একটা ভেসে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে জলটা বেসিনের মধ্যে ফেলে দিলাম। আমি খুব ভীতু মানুষ; শরীর নিয়ে আমার খুঁতখুঁতুনির অন্ত নেই। খালি চোখ; চশমাটা বালিশের তলায় পড়ে আছে; জলের মধ্যে কী ভেসে উঠেছিল, বুঝতে পারলাম না। সকাল বেলায় এইরকম একটা কাণ্ড হওয়ায় সামান্য চমকের মতন হল। তারপরই আমার মনে পড়ল, আরে ওটা আমার ডান হাতের তিলটা নয় তো? হাত ভরতি কুলকুচোর জল থাকায় খালি চোখে ওই রকম দেখিয়েছিল? ডান হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরলাম। আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু আমার কেমন ছেলেমানুষের মতন মজা লাগল; কিংবা সাধারণ এক কৌতূহল হল, পরিষ্কার জলের মধ্যে হাতের তিলটা কী ওই রকম দেখায়? বার কয়েক পরীক্ষাও করলাম; কিন্তু সচেতন হবার পর আগের মতন চোখের ভ্রমটা আর ঠিক হল না।

ঘরে এসে চোখ-মুখ মুছে চশমাটা পরার পর আর একবার হাতটা দেখলাম। তিলটা যথাস্থানেই আছে।

স্ত্রী চা নিয়ে এল। জানালার কাছে বসেছি ততক্ষণে। একবার মনে হল, সকালের মজার কথাটা স্ত্রীকে বলি। বললাম না। মেয়েরা সকালে এমনিতেই ব্যস্ত থাকে, তার ওপর আমার স্ত্রী তার স্বামীর শরীরের খুঁতখুঁতুনির ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ। আমার মতন ভীতু মানুষেরও মনে মনে একটা অহঙ্কার আছে;

অভিমানও বলা যায়। এই সকালে সেটা নষ্ট হতে দিতে ইচ্ছে হল না।

বাসি খোঁপা খুলতে খুলতে স্ত্রী চলে গেল। ছেলেমেয়ের গলাও কানে আসছিল। চা খেতে খেতে সিগারেট ধরালাম। কাগজ এসেছে হয়ত, অরণ্যদেবের পালা শেষ হয়ে আমার কাছে পৌঁছতে দেরী হবে। ইংরিজী কাগজটাও দেখছি না। সকালে কাগজ খোলার সময় মনে মনে আমি একটা অঙ্ক করি, তিন পাঁচ না সাত? আগে এক দুই তিন—এর বেশী ভাবতাম না। আজকাল দশ বারো পর্যন্ত উঠি। খুনের সংখ্যা বাজার দরের মতন বাড়তির দিকে যে, আমাকেও বেশী বেশী ভাবতে হচ্ছে। আগে, বেশ কয়েক বছর আগে, আমি সারাটা গরমকাল কাগজে কলেরা রোগীর হাসপাতালে ভরতি হওয়ার সংখ্যা দেখতাম, অনুমান করতাম, আর ভয়ে ভয়ে শুকিয়ে যেতাম। আজকাল খুনের সংখ্যা দেখি।

আজ অবশ্য অকারণেই আমার মনে ওই তিলের কথাটা আসা-যাওয়া করতে লাগল। বার কয়েকই হাতটা ওঠালাম, দেখলুম।

হাতটাত দেখার ব্যাপারে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছু নেই। তিল, যব—এইসব চিহ্নের অর্থটর্থ কী, তাও আমি জানি না। কাশীতে থাকার সময় সদ্যযৌবনে হাত দেখা নিয়ে দিন কয়েক খুব মেতেছিলাম। তারপর আমার পছন্দসই মেয়েটির সঙ্গে প্রেমট্রেম ভেঙে গেলে ও ব্যাপারে আর কোনো উৎসাহ হয়নি। তবু, আমি শুনেছি, হাতে তিল থাকা খারাপ। নানা ধরনের খারাপের মধ্যে থাকতে থাকতে এই প্রায়-পঞ্চাশ বয়সে ছোটখাট খারাপের কথা বড় করে ভাবি। কিন্তু ওটা তিল না যব, না অন্য কিছু তা আমার জানা নেই।

আজ সকালে সবই অন্যরকম হল। চা, সিগারেট, শিবপুর-হাওড়া মিলিয়ে ন'জন খুন, মোহনবাগানের হার, মনুমেন্টের তলায় সভা—ইত্যাদি কোনো কিছুই আমার মন থেকে তিল-চিন্তাটা ধুয়ে দিতে

পারল না। বাচ্চা চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাজার গেলাম, ফিরলাম। দু-একটা টুকটাক কাজ সেরে দাড়ি কামাতে বসলাম, স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে শেয়ারের ট্যাক্সিতে অফিসে এলাম—তবু দেখি তিল আমার মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। কখনও সরে যাচ্ছে হয়ত, আবার যেন জলের নাড়াচাড়ায় ওপরে উঠে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি কেমন চমকে উঠে ফেলে দিচ্ছি। দিলেও সেটা আবার চোখে এসে পড়ছে।

আমাদের বিভূতি দুপুর গড়িয়ে অফিসে এল: এসে বলল, তাদের পাড়া রণক্ষেত্র হয়ে আছে। নানা জনে নানান খবর নিতে লাগল বিভূতির কাছে। আমি তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না।

পালিত বিকেলের শেষাশেষি আমার পাশে এসে বসে গল্প জমাবার চেষ্টা করল, মুখ খারাপ করল, তারপর আমার তরফ থেকে তেমন সাড়াশব্দ না পেয়ে বলল, 'তোমার হল কী রায়, বুড়ো বয়সে কিছু ঘটিয়ে ফেলেছ নাকি!' বলে চোখ টিপল, 'তোমার রোগা হাড়ে ভেলকি দেখাচ্ছ যে!'

পালিত উঠে গেল। কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে, পাখার বাতাসে অফিসের দেওয়ালে ঝোলানো লম্বা ক্যালেণ্ডারটা উড়ছে দেখতে দেখতে বাঁ দিকের জানলা দিয়ে শেষ বর্ষার দল ছাড়া মেঘের ঘুরে বেড়ানো নজর করতে লাগলাম। বিশু ছেলেটি নতুন বিয়ে করেছে, এই অফিসেরই মেয়েকে; বিশু আমার কাছে এসে বলল, 'নন্দদা আজ একবার টালিগঞ্জ যেতে হবে, মানে ইয়ের ব্যাপার, ওদিকে যাওয়া খুব রিস্ক। আমি একটু আগে আগে যাচ্ছি।'···বিশু যদিও 'আমি' বলল কিন্তু ওটা 'আমরা' হবে; ওরা দুজনেই পালাচ্ছে, টালিগঞ্জে ওর শ্বশুরবাড়ি। বিয়ের সময় রিস্ক ছিল না; এখন রিস্ক। পুরো মিথ্যে কথা বলল। বলুক, এই বয়সে সবাই বলে।

অফিস থেকে ছুটির পর বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেড চলে এলাম। সঙ্গে আমাদের মিসেস চৌধুরী ছিলেন; মেজসাহেবের

স্টেনো। তিনি ট্রাম গুমটির দিকে চলে গেলেন। আমি একলা। সমস্ত এলাকা জুড়ে অফিস-ফিরতি মানুষের ছুটোছুটি, ব্যস্ততা, কলরব। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, গাড়ি যে যার মতন ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে যাচ্ছে। ওরই মধ্যে কেউ কেউ ভিড় এড়াতে কার্জন পার্কের টুকরো টুকরো মাঠে গিয়ে বসেছে, এক জায়গায় ঘোড়ার গল্প জমেছে, দু চারটি ছেলেমেয়ে প্রেম-ভালবাসা করতে করতে হাওয়া খেতে গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছে।

আমার মতন নির্জীব মানুষের পক্ষে আপাতত বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়। এতটা সকাল সকাল আমি সচরাচর বাড়ি ফিরি না। ভিড়-টিড় যথাসম্ভব এড়িয়ে পশ্চিমদিকের মাঠে একটু পরিষ্কার জায়গা খুঁজে বসলাম। মাথাব ওপর আকাশটা যে বদলে আসছে এই প্রথম খেয়াল হল আমার; টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার আকাশও যেন আজকাল চোখে পড়ে, হালকা নীলের ভাব এসেছে আকাশে, বেলা ছোট হয়ে গেছে, ভেজা বাতাসে বর্ষার গন্ধ শুকিয়ে আসছে।

সিগারেট ধরিয়ে আলস্য এবং আরামের সঙ্গে টানতে টানতে মানুষজন, গাছপালা, ঘাস, আকাশ দেখছিলাম। আবার আমার মনে তিলের কথাটা ভেসে উঠল। এবার আর আমি হাত তুলে তিল নজর করলাম না। সারাদিনে অনেকবার দেখা হয়েছে, আর নয়। অনর্থক দাগটা দেখে লাভ নেই। যতবার দেখি, ততবার যেন মনে হয় তিলটাও আমায় দেখেছে। বিরক্তি হয়, বিশ্রী লাগে।

এই তিলটা হতে হতে, মানে আমার প্রথমে চোখে পড়ার পর, ক্রমে ক্রমে বেড়ে আজকের মতন হয়ে আসতে বছর খানেক কি তার সামান্য বেশী সময় লেগেছে। প্রথম যখন আমার নজরে পড়ল তখন আমার মনে হয়েছিল, কাঠকুটোর চোঁচ কিংবা ময়লা টয়লা কিছু চামড়ার তলায় ঢুকে গেছে। ভাল করে সাবানে হাত ধুয়ে রগড়ে ওটা তুলে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম। ভাঙা মেথির মতন কালচে

দাগটা উঠল না। একদিন স্ত্রীকে দেখালাম। সে বলল, তিল। হাতের পাতায় তিল তুলে ফেলার কোনো প্রক্রিয়া আমার জানা ছিল না। শুনেছি, কোনো কোনো বাড়ন্ত আঁচিল শেষ পর্যন্ত ক্যানসারে গিয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু তিল থেকে ক্যানসার হয় এ আমি শুনিনি। শরীরের নানা জায়গায় আমার অসংখ্য তিল রয়েছে, তার খুব কমই আমার চোখে পড়ে। ওসব নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। আমিও ঘামাতে চাইনি। কিন্তু ডান হাতের পাতায় এই ছোট্ট তিলটা বাড়তে লাগল, আর বাড়তে বাড়তে এখন বেশ স্পষ্ট, কালো, প্রায় গোল হয়ে এসেছে। একে ডান হাত, তাও আবার তালুর গর্তের মধ্যে দিব্যি বসে আছে বলে তিলটা দিনের মধ্যে কতবার যে নজরে পড়ে! নজরে পড়লেই যে লক্ষ করি তা নয়, মাঝে মাঝে করি।

আজ সকালে ওই রকম একটা কাণ্ড হয়ে যাবার পর কেন জানি না তিলটা আমার মনের মধ্যে বিশ্রী এক অস্বস্তি জাগাচ্ছিল। একেবারেই অকারণে আমি ঘুরে-ফিরে তিলটার কথা ভাবছিলাম। শেষে একটা বাতিকের মতন দাঁড়িয়ে গেল।

সিগারেটটা প্রায় যখন শেষ, তখন হঠাৎ আমার মনে হল, একটা হিসেব করা যাক গত এক দেড় বছরে আমি কী কী করেছি। হাতের পাতায়, রেখার ওপরে হোক, কিংবা আশে-পাশে কোথাও হোক, তিল হওয়া খারাপ, মানুষের নানারকম পাপকর্ম বোঝায়—এটা আপাতত মেনে নিয়ে দেখা যাক না আমি কোন কোন দুষ্কর্ম ইদানীং করেছি।

নিজেকে নিয়ে মানুষ বাস্তবিক তেমন করে ভাবে না। শরীর স্বাস্থ্য, টাকা পয়সা, অফিসে প্রমোশান—এইসব ভাবনা ছাড়া সে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে বা ভাবতে বড় একটা রাজী হয় না। আমিও যে হই, তাও নয়। তবু আজ একবার ভাবা যাক, ক্ষতি কী! এখনও এমন কিছু সন্ধ্যে হয়ে যায় নি, চারপাশে এখনও ভিড়, ট্রামে

লোক ঝুলছে, পার্কের কিছু বাতি জ্বলে উঠেছে, কিছু ওঠেনি, বাতাসটা বেশ চমৎকার, আকাশটাও বৃষ্টি বাদলা হবার মতন নয়।

আমার আপাতত পরিচয় কী এটা আমি প্রথমে খুব সংরক্ষিত-ভাবে ভেবে নিলাম। আমি একেবারে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি; উত্তর কলকাতায় শহরতলী ঘেঁষে থাকি, বয়স প্রায়-পঞ্চাশ, চাকরি বাকরি মোটামুটি রকমের, বাড়িতে স্ত্রী আছে, তিনটি ছেলে-মেয়ে, মেয়ে বড়, কলেজে ঢুকেছে সবে। আমার পিতৃদত্ত অর্থ নেই, শ্বশুরও কিছু দানধ্যান করেননি। শরীর স্বাস্থ্য আমার বরাবরই দুর্বল, নানা বাতিক আছে, আমি নিজেও সেজন্যে লজ্জিত। সাংসারিক-ভাবে আমি অখুশী নই।

আমার মতন একজন গৃহস্থ পুরুষ কী কী অন্যায় করে থাকতে পারে আমি ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম। যৌবনে কোথায় কী করেছি সেসব কথা আসে না। হাতের তিলটার বয়েস বছর খানেক কি দেড়েকের। অঙ্কের হিসেব মতন আমি আরও খানিকটা সময় পিছিয়ে নিয়ে নিজের ন্যায়-অন্যায়ের হিসেব করতে পারি।

গত দু বছরের মধ্যে আমার যা যা হয়েছে ভেবে দেখতে গিয়ে একটা হিসেব করে ফেললাম। চাকুরিতে সামান্য উন্নতি হয়েছে, মাইনেপত্র কিছু বেড়েছে; টাকা পয়সা জুটিয়ে কাঠা আড়াই মতন জমি কিনেছি বাঙুরে। চাকরির উন্নতিতে, আমি কাউকে ধরাধরি, কাউকে টপকে আসি নি; ওটা স্বাভাবিক উন্নতি। জমি কেনার সময় যৎসামান্য পুঁজিতে হাত দিয়েছি, ধার করেছি অফিস থেকে, অফিসের যোগেশ আমায় হাজার দুয়েক টাকা ধার দিয়েছে। আমার চাকরিতে ঘুষ নেই, বাইরের উপরি নেই। কাজেই ও কথা ওঠে না। তা হলে?

এবার নিজের চরিত্রের দিকে তাকানো যাক। ন'মাসে ছ'মাসে বন্ধুদের সঙ্গে এক আধবার মদ্যপান করেছি। মদ আমার সয় না। অল্পস্বল্প খেয়েই ক্ষান্ত হয়েছি। রেস, ঘোড়া, আমি জানি না।

অফিসে যারা মাঠে আসা-যাওয়া করে তারা আমায় মাঠে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েও পারেনি। আমার নেশার মধ্যে চা, সিগারেট, এক আধটা পান। মাঝেসাঝে হরতাল হলে বাড়িতে বসে তাস খেলি। আমার বউ আমার চেয়ে বুদ্ধি ধরে, টুয়েনটি নাইন খেলতে বসেও হেরে যাই। সিনেমা দেখি কদাচিৎ সময় কাটাতে। বাস্তবিকই আমার মনে পড়ছিল না, গত দু বছরে আমি কী কী অপরাধ করেছি। চুরি করিনি, বাড়ির ঝি-চাকর তাড়াই নি, অফিসে কারও কোনো ক্ষতি করি নি। আমার বাড়িতে ফলস্ রেশন কার্ড নেই, লোকজন এসে পড়লে এক আধদিন ব্ল্যাকে চাল কিনতে হয়েছে অবশ্য, কিন্তু এই অন্যায়ও আমার স্বহস্তে নয়, বউ চাকর পাঠিয়ে কিনে আনিয়েছে।

নিজের কোনো বড় রকমের দুষ্কর্ম আমার মনে না আসায় আমি খানিকটা খুশী হলাম। তারপর আচমকাই আমার মনে ধর্মাধর্মের কথা এল। হিন্দুর ছেলে আমি, পূজোপাঠ করি না, ঠাকুর দেবতায় ভক্তি অভক্তি কোনোটাই নেই, স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গেলেও গঙ্গার ধারে বসে থেকেছি, স্ত্রী মন্দিরে গিয়েছে। পাড়ায় দুর্গাপূজোর সময় একদিন গিয়ে একটু সময় আরতি দেখে আসি। আমার মনে হল না, এটা কোনো অধর্ম? তবে?

আশেপাশে তাকালাম। সন্ধ্যে হয়ে এল। উত্তরের দিকে কয়েকটা বাতি খারাপ হয়ে নিবে রয়েছে। মাঝে-মাঝে চমক মারছে। নেবা বাতিগুলো চমক মেরে বার কয়েক জ্বলল, নিবল, শেষে নিবেই থাকল। এখন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে এদিকটায়। রোজগারী দুটি মেয়ে সেজেগুজে মাঠের মধ্যে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ আমার স্ত্রী ঘটিত ব্যাপারট্যাপার মনে এল। বিয়ের আগে আগে নমিতা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বসাবসি ছিল। প্রেমট্রেম নয়। ইংরেজীতে যাকে বলে ফনডল—আমার সঙ্গে নমিতার বসাবসির মধ্যে তার বেশী করার কিছু ছিল না।

একবার আমরা জনাচারেক বন্ধু মিলে মেমসাহেব মেয়েছেলে দেখতে গিয়েছিলাম। এ সবই বিয়ের আগে, আজ উনিশ কুড়ি বছর পরে নিশ্চয় তার জন্যে হাতে তিল হবার কথা নয়। বিয়ের পর আমার রমণী বিষয়ে উৎসাহ আছে বলেও তো মনে হয় না। একটি রোগাসোগা মেয়ে কিছুকাল আমাদের অফিসে কাজ করতে এসে মাঝে সাঝে বাড়ি ফেরার পথে আমার সঙ্গী হত। ট্যাক্সি করেও কখনো সখনো আমাদের ফিরতে হয়েছে। একবার ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে রিকশা করে ফেরার সময় আমি তার পা, হাঁটু, উরুর চাপ ছাড়া অন্য কিছু অনুভব করিনি। খুবই দুঃখের কথা মেয়েটি মারা গেছে। তার নাম ছিল রেখা।

আমার আর কিছু মনে পড়ছিল না। চারপাশ হাতড়াতে গিয়ে আরও যে দুটি অশোভন কর্মের কথা মনে পড়ল, তার একটি অন্তত তিন বছর আগে ঘটেছে। আমরা সপরিবারে দীঘায় বেড়াতে গেলে আমার বন্ধু মনীন্দ্রর স্ত্রীকে একদিন সিক্ত বসনে দেখেছিলাম। এবং চোখ সরিয়ে নিতে দেরী হয়েছিল। আর অন্যটি ঘটেছে তার কিছু পরে, আমার চটপটে এক শ্যালিকা, স্ত্রীর মামাতো বোন, তার বিয়ের ব্যবস্থা করে আমার কাছে সাহায্যের ব্যাপারে এসেছিল। আমি তাকে একটি বৃহৎ চুম্বন করে বলেছিলাম, 'এটা হল নমস্কারী, বুঝলে। এবার সম্মুখ সমরে নেমে পড়ো।' বিজু তার গাল মুছে আমায় একটা প্রণাম করে চলে গেল। বিজু খুব চমৎকার মেয়ে। একটানা বারো চোদ্দ বছর লড়ে উঁচু মাথায় তিরিশ বছর বয়সে সে বিয়ে করে চলে গেছে। বিজুকে আমি স্নেহ করি।

এত রকম ভাবার পরও আমার এমন কিছু মনে পড়ল না যা আমার কাছে ভয়ঙ্কর একটা পাপ বলে মনে হল। গত দেড় দু বছরে বাস্তবিকই আমি কিছু করিনি, একেবারে ছা-পোষা গৃহস্থ মানুষ হিসেবে দিন কাটিয়েছি। প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে চা খেয়ে দিনটা শুরু করেছি, আর রাত্রে শোবার আগে

স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছি। অফিসে কিংবা বাড়িতে যেসব তুচ্ছ অশান্তি, রাগারাগি হয়েছে তা সব মানুষেরই জীবনে নিত্য হয়ে থাকে, ওটা ধরার নয়। আমি এখন প্রায় নিশ্চিত হতে পারি যে ইদানীং এমন কোন অন্যায় বা পাপ আমি করিনি যে হাতের পাতায় একটা কালো তিল দেখা দিতে পারে! ওটা ভবিষ্যতের কোনো অশুভ ইঙ্গিত হতে পারে কিন্তু অতীতের নয়।

প্রসন্ন মনে এবার একটা সিগারেট ধরালাম। এখন ওঠার সময় হয়ে এসেছে। মানুষজন কমে গেছে, হালকা ভিড়ের ট্রাম আসছিল, মাঠ থেকে লোকজন প্রায় উঠে গেছে, সন্ধ্যে হয়েছে অনেকক্ষণ। সিগারেটটা খেয়ে উঠে পড়ব। আস্তে আস্তে আরাম করে সিগারেট খাচ্ছি, নজরে পড়ল প্যান্টট্যান্ট পরা দোহারা চেহারার একটি লোক আমার দিকে আসছে। কাছাকাছি এলে মনে হল, তার পা ঠিক মতন পড়ছে না, মাথা ঘাড়ের পাশে হেলে রয়েছে, টলে টলে আসছে। লোকটা আমার কাছে এসে দাঁড়াল একটু, দেখবার চেষ্টা করল, পকেট থেকে হাত বের করে একটা দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট ফেলে দিল, অনর্থক আমায় 'শালা' বলল। নিতান্তই মাতাল। তারপর আবার টলতে টলতে খানিকটা গিয়ে মাঠে শুয়ে পড়ল, একেবারে হাত পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে। মদের গন্ধ আমার নাকে না গেলে আমি নিশ্চয় ভয় পেতাম। ভাবতাম লোকটা ছোরাছুরি খেয়ে পালিয়ে এসে এখানে মরছে। কিন্তু হারামজাদা যে প্রচণ্ড মদ খেয়েছে সেটা তার সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছি। লোকটা এখন শুয়ে থাকুক মাঠে, বেহুঁশ হয়ে, রোজগারী মেয়ে, চোর, পকেটমার, এখন ওকে নিয়ে যা করার করুক।

চোখ ফিরিয়ে গুমটির দিকে তাকাতে আমি অবাক। মেট্রো সিনেমার দিক থেকে চাঁদটা কখন উঠে এসেছে। বেশ বড় চাঁদ।

টুকরো টুকরো ছুটো পেঁজা মেঘ খুব নীচু দিয়ে একে অন্যকে ধরার জন্যে ছুটে ছুটে পালাচ্ছে, পেছনের মেঘটার চেহারা ক্রমেই লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, যেন সে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে, পেছনের পা লম্বা হয়ে গেছে দৌড়তে দৌড়তে।

চাঁদের আলোটা এতক্ষণে আমার নজরে এল। জ্যোৎস্নাও কত আড়ষ্ট হয়ে আসে আজকাল। কলকাতাকে সকলেরই কী ভয়!

এবার ওঠা যেতে পারে। আজকাল কলকাতা বড় নিরাপদ নয়। উঠি উঠি করেও উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নিরিবিলি এই বিশ্রামটুকু আমার ভালই লাগছিল। বিশেষ করে আমি এখন নিশ্চিন্ত, সকাল থেকে মনের মধ্যে যেটা খচখচ করছিল বাস্তবিক আমি সেটা ভুলে ফেলেছি। আমার ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম সমস্ত যথাসম্ভব বিচার করে এমন কোনো অপরাধের কথা আমার মনে পড়ল না যাতে আমি গ্লানি বোধ করতে পারি।

তবে ওঠা যাক ভেবে উঠতে গিয়ে দেখি চারপাশ ঝপ্ করে অন্ধকার হয়ে গেল। আরে, এ কি? সমস্ত এসপ্লানেড জুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার, পার্কে বাতি জ্বলছে না, ট্রাম গুমটি অন্ধকার, রাস্তা-ঘাট কালো হয়ে গেছে। কলকাতা অন্ধকার হয়ে গেলে বড় ভীষণ দেখায়, মনে হয় যেন যে কোনো দিক দিয়ে চোর, গুণ্ডা, খুনে, বদমাশ ছুটে আসছে। আমার ভয় হল। আর দেরী না করে উঠে পড়লাম। মাতালটা দিব্যি শুয়ে আছে, হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছে। অন্ধকার চোখে সয়ে যাবার পর চাঁদের আলোটা এতক্ষণে এক রকম পরিষ্কার হল।

পার্ক থেকে উঠে আসার সময় আমার খুবই বিরক্ত লাগছিল। আজকাল ইলেকট্রিসিটি নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে। যখন তখন, যেখানে সেখানে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমরা যে কী রাজত্ব চালাচ্ছি আজকাল।

চৌরঙ্গির দিক দিয়ে গাড়ির হেড লাইটের আলো বড় বড় চোখ করে ছোটাছুটি করলেও আমি ওদিকে যাবার চেষ্টা করলাম না।

গাড়ির আলো ভীষণ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওদিকটা আরও বিপজ্জনক।

ট্রামগুলো সার সার দাঁড়িয়ে গেছে। মানে ট্রামের তারেও কারেন্ট নেই। বাঃ। চমৎকার! সব দিক দিয়ে চমৎকার!

খুঁজে খুঁজে একটা এক নম্বর ট্রামে বসা গেল। দু চারজন মাত্র লোক। একেবারে সামনের সিটে গিয়ে বসে পড়লাম। বিশ পঁচিশ কি আধঘণ্টা দেরী হতে পারে, ট্রামটা ঠিকই ছাড়বে। পা তুলে, পেছনের সিটে মাথা হেলিয়ে আরাম করে বসে চোখ বুজে থাকলাম। এই সময় আমার মনে মনে একটা গান আসছিল, হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যে হল, পার করো···

গায়ের পাশে ঠেস দিয়ে কে যেন বসছে আমার, কেমন একটু শব্দ হল। খানিকটা ভয়ে, খানিকটা বা বিরক্তিতে চোখ খুললাম। খুলেই অবাক! কী সর্বনাশ, এ যে···

"কী হল?"

"আরে বিজু তুমি কোথ্ থেকে? কী কাণ্ড!"

"বসে বসে ঘুমোচ্ছিলেন নাকি?"

"না, হরি দিন তো গেল গাইছিলাম···"

"এখনই? আরও দিন পড়ে আছে গাইবার।"

"আরও পড়ে আছে—? পঞ্চাশ হয়ে এল, বিজু। এবার মানে মানে···"

"এদিকে কোথায়?"

"এই একটু বেড়াতে। মাঠে বসেছিলাম। ট্রাম ফাঁকা না হলে যে উঠতে পারি না। তা তুমি কোত্থেকে?"

"আমিও এদিকে এসেছিলাম। আলোটালো সব বন্ধ হয়ে গেল, ট্রামে উঠব, হঠাৎ আপনাকে চোখে পড়ে গেল।"

"এত অন্ধকারেও আমাকে চোখে পড়ে? তোমার এখনও সেই চোখ আছে?" আমি একটু হাসলাম।

"তা আছে" বিজুও যেন হাসল।

"বেশ করেছ! অনেকদিন তোমায় দেখি নি। আজই তোমার কথা ভাবছিলাম।"

"আমারও আপনার কথা মনে পড়েছিল।"

"কেন বলো তো?"

"আপনিই বলুন না আগে, আপনার কেন মনে পড়ছিল।"

খানিকটা ভেবে চিন্তে খাটো গলায় বললাম,···তোমায় বলা যেতে পারে। আশেপাশে লোকজন আছে নাকি?"

বিজু মাথা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বলল, "না ; একেবারে পেছনে জনা দুই বসে আছে। কণ্ডাক্টর লেডিজ সীটে বসে বসে ঘুমোচ্ছে।"

"যাক তাহলে কেউ শুনবে না।···বুঝলে বিজু আজ সকালে মুখ ধোয়ার সময় একটা কাণ্ড হয়ে গেল—।" কাণ্ডটা বিজুকে সংক্ষেপে বললাম। "ডান হাতের তিলটা নিয়ে সারাদিন বড় অশান্তিতে কেটেছে। ব্যাপারটা কিছুই নয়, তবু মনের মধ্যে কেমন একটা খচখচ করছিল। নিজের একটু হিসেব নিকেশ করছিলাম। কিছু খুঁজে পেলাম না। রিসেন্টলি—দেড় দু বছরের মধ্যে আমি কিছু করি নি ; নাথিং সিনফুল···"

বিজু আমার ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলল। ট্রামটা এমন করে দাঁড়িয়ে আছে যে আমাদের দিকে চাঁদের আলোটুকুও নেই। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

"বুঝলে বিজু, আমার শেষ সুকীর্তি কিংবা অপকীর্তি যাই বলো সে হল তোমার বিয়ের আগে তোমায় সেই চুমু খাওয়া" বলে রগড় করে আমি একটু হাসলাম।

বিজু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আপনার অপকীর্তি নেই?"

"না। মনে করতে পারছি না।"

"আমি বলব?"

"তুমি, তুমি কী করে জানবে?

"জানি।"

আমি কেমন অবাক হয়ে বিজুর দিকে তাকালাম। আমার খেয়ালই হয় নি বিজু একেবারে নিরলঙ্কার নিরাভরণ, গায়ের শাড়িটা পর্যন্ত সাদা। বিজুর এই অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছিল।

বিজু বলল, "আমার বিয়ের পর আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। সে প্রায় দু বছর হতে চলল।"

"তুমি আর আসো-টাসো না। তাছাড়া—"

আমায় কথা শেষ করতে না দিয়ে বিজু বলল, "আমি কেন যাই না সেটা আপনি জানেন। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনিও কি আমার খোঁজ নিতে চেয়েছেন? চান নি? আপনি যে জন্যে চান নি. আমিও সেইজন্য যাই নি।···ও কথাটা যাক। আপনি অপকীর্তির কথা বলছিলেন। আচ্ছা জামাইবাবু আপনি বেচারী অভয়কে অফিসের ক্যাশ-বেয়ারা থেকে নামিয়ে ডাকবেয়ারা করে দিয়েছিলেন কেন?"

"অভয় পয়লা নম্বরের চোর। ও দু তিনবার অন্যের টাকা পয়সা নিয়ে গণ্ডগোল করেছে।"

"অভয় চোর? বেশ অভয় না হয় চোর হল। কিন্তু সুশান্ত কী অন্যায় করল?"

"কোন সুশান্ত? মিত্তির না চক্রবর্তী?"

"আপনি পূজোর প্রসাদ খান না কিন্তু বামুন কায়স্থ জ্ঞানটা আপনার আছে, জামাইবাবু। বাজারে গিয়ে আপনি দরাদরি করেন না, ফিরতি পয়সা গুনে নেন না, তা বলে আপনি অত বেহিসেবী আত্মভোলা নয়। ভদ্রলোক বলে আপনার যতটা অহঙ্কার, তার চেয়েও বেশী আপনার লোকদেখানো মর্যাদা। তা যাক গে, আমি সুশান্ত চক্রবর্তীর কথা বলছি। ওই ছেলেটাকে আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে সরিয়ে মিত্তিরকে এনে বসালেন কেন? সে তো কাজকর্ম জানে না ভাল, ফাঁকিবাজ।"

"বিজু এ সব অফিসের কথা। আমায় নানা দিকে চোখ রেখে চলতে হয়। চক্রবর্তীটা পলিটিকস্ করে। পলিটিকস্ করা ছেলে-গুলোকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না। দেশটার কী হাল করেছে দেখেছ?"

"জামাইবাবু সুশান্ত মিত্তিরের বাবার যদি পাতিপুকুরে বাড়ি না থাকত, আর কায়স্থ না হত আপনি তাকে আপনার আওতায় এনে বসাতেন না। দিদি আপনাকে বলে না যে মালা সুশান্তর সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াতে যায়?"

"বিজু তুমি আমার মেয়ে সম্পর্কে যা বলেছ, তোমার সম্পর্কেও তো আমি সেটা বলতে পারি। তুমি তো নিজেই নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলে।"

"করেছি তো। কিন্তু আপনি যে আপনার মেয়ের জন্যে বারো আনা সাজিয়ে দিচ্ছেন। নিজের ভালবাসার জোরে ও কতটুকু আর করছে।"

"তুমি তা বলতে পার। আমি বলি না। বাবা হিসেবে আমার কিছু কর্তব্য আছে, সেইটুকু করছি।"

বিজু যেন হাসল। "তা হলে করুন। কর্তব্য করা ভাল। এই তো আপনি জমি কেনার সময় কেদাববাবুর অফিস-লোনটা চাপা দিয়ে রেখে নিজের লোনটা নিয়ে নিলেন। বলবেন আপনি আপনার সংসারের ওপর কর্তব্য করতে জমি কিনেছেন—এই তো?"

"আচ্ছা! তুমি দেখছি আমার অফিসের সব হাঁড়ির খবরই রাখো? কেদারবাবুকে তুমি চিনলে কী করে?"

"চিনি।"

"এক পাড়ায় থাক নাকি?"

"থাকতে পারি!"

"বাঃ বেশ জুটেছ তো সব। তুমি সুশান্ত চক্রবর্তী কেদারবাবু অভয় সকলেই এক পাড়ায়।"

"আরও আছে।"

"আবার কে?"

"রেখা।"

"সে তো মারা গেছে।"

বিজু হেসে উঠল। আমি চমকে উঠলাম।

"হাসছ যে?"

"মরে যাওয়া লোকও থাকে জামাইবাবু। আমিও তো মরে গেছি।"

"তুমি? কী বলছ?"

"বাঃ, আমি মরলাম না। সেই যে বিয়ের আগে আপনার কাছে গেলাম, আপনি পাঁচশোটা টাকা দিলেন চুপি চুপি। খুব আদর করে চুমু খেলেন, তার পরই তো আমি আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মরে গেলাম।"

"বলেছ বেশ—" হাসতে হাসতে বললাম, "বুকের তলায় টাকাগুলো নিয়ে গাড়ি চাপা পড়লে নাকি?"

"আপনি তো তার আগেই আমায় চাপা দিয়ে গেছেন।"

চমকে বিজুর দিকে তাকালাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সাদা বিজু বসে আছে। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। মনে হল, আমি কতকাল ধরে অন্ধকার এই ট্রামের মধ্যে লুকিয়ে কোনো জন্তুর মতন বসে আছি। তাই কি নয়? এই জগৎটা যেখানে নিবে অন্ধকার হয়ে আছে। সেখানে আমি খুব একা। আমাকে আমিই শুধু অনুভব করতে পারি। দেখতেও পাই না। আমি সেখানে কত যে ভীতু! লুকিয়ে থাকা ছাড়া পথ নেই।

"বিজু?"

"উঁ!"

"তুমি আমায় ক্ষমা করো।"

বিজু চুপ। তার সাড়া শব্দ নেই। শেষে ফিসফিস করে বলল,

"জামাইবাবু। একটা কথা আপনাকে বলি। আপনি অফিসের বড়বাবু হয়ে তারিখের হিসেবটা ভালোই শিখেছেন। কিন্তু একটা জিনিস শেখেন নি। ক্যালেণ্ডারের পাতায় ছাপা লাল তারিখগুলোই সব নয়। কালোগুলোই বেশি। তাই নয়? আপনি শুধু লাল তারিখগুলো এতোক্ষণ খুঁজে মরছিলেন।"

এমন সময় দপ্ করে বাতি জ্বলে উঠল। এতক্ষণ অন্ধকারের পর বাতিগুলো জ্বলে উঠতে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। সামান্য পরে চোখ খুলে দেখলাম, আমার পাশে পার্কের সেই জোড়া মেয়ের একটা বসে আছে। ট্রাম গোঁ গোঁ শব্দ করে উঠতে সে নেমে গেল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম তাকে।

তারপর ট্রাম কখন চলতে লাগল, এসপ্ল্যানেড্ময় বাতি জ্বলে উঠল। আমি ট্রামের সীটে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে খুব সাহসী হয়ে বসে থাকলাম।

যেতে যেতে, বিষণ্ণ উদাস অসহায় হয়ে আমি শুধু নিজের কথা ভাবছিলাম। আমার হাত থেকে তিলটা ফেলে দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওটা ধুয়ে যাক—আমার হাত স্বাভাবিক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক। কিন্তু তা হয় না—। হবার উপায় নেই।

ট্রামটা যেন আমাকে অন্ধকার থেকে বের করে পরমানন্দে নাচতে নাচতে নিজের দরজায় পৌঁছে দিতে নিয়ে যাচ্ছিল।